বরষা রাত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্টল নং—২১ ॥ ব্লক নং—৫
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ পুস্তকালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ নববর্ষ
১৩৫০

প্রকাশক ঃ
তনুশ্রী বিশ্বাস
তেঘরিয়া
২৪ পরগণা

ছেপেছেন
স্মিতা আচারিয়া
এ্যাঞ্জেল প্রিণ্টার্স
৪৩৭ বি রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

বরষা রাত

: আমাদের অনুমোদিত পরিবেশক :

উত্তরবঙ্গ

জে. চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

মালদা

মুর্শিদাবাদ

বুক কর্ণার

বহরমপুর

২৪ পরগনা

অনুপমা

কোর্টরোড

বনগ্রাম

আসাম

পুঁথিঘর

সেণ্ট্রালরোড

শিল-চর

পপুলার স্টোর্স

ধুবাড়ি-আসাম

ত্রিপুরা

মডার্ণ বুক সোসাইটি

আগরতলা

বেনারস

মুখার্জী বুক ডিপো

পাণ্ডে হাউলি

বেনারস

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা।

সুতরাং অনেকেরই সে বছরের দুর্দান্ত দুর্যোগের কথা মনে থাকা উচিত। বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, উত্যক্ত হবারও। কিন্তু সেবারের বৃষ্টি যেন মনে হয়েছিল আকাশের দেবতার আক্রোশ। সমস্ত কিছু ভাসিয়ে না দিতে পারলে বুঝি সে আক্রোশ মিটবে না।

কাগজ খুললেই ত দেখা যেত বন্যার খবর। এখানে রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, সেখানে গ্রাম ভেসে গেছে। অনেক জায়গার মানুষের ত এমন অবস্থা যে জলচর না হলে আর বাঁচবার উপায় নেই।

বরাকর নদীর ধারে একটি বিরাট বাড়ির কটি বাসিন্দার সেই অবস্থাই হয়েছিল।

চারিদিকে থই থই জলের মধ্যে বাড়িটি পার্বত্য দ্বীপের মতই কোন মতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

একতলার ঘরগুলোর মেঝে বেশ উঁচু হলেও জল তার প্রায় কানায় কানায়।

দরজা খুললেই জলে নামা যায়।

আর ওপর তলার ঘরগুলোর জানালা থেকে যে দিকেই দৃষ্টি ফেরানো যাক না কেন শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে দু চারটে উঁচু গাছের মাথা না জেগে থাকলে মনে হত বুঝি সৃষ্টির সেই আদিম জলময় পৃথিবীই আবার জেগে উঠেছে।

বন্যায় চারিদিক ডুবে যাওয়ার দরুণ সমস্ত লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বাড়িতে অবিরাম দুর্যোগের মধ্যে নিরুপায় ভাবে দিনরাত্রি কাটানই ত এক যন্ত্রণা তার ওপর ওই বাড়িটির কটি বাসিন্দার জীবন আর এক অজানা আতঙ্কে তখন দুর্বিষহ।

নামহীন এক বিভীষিকার অদৃশ্য পদ সঞ্চার ক্রমশই সেই অভিশপ্ত বাড়িটির দিকে যেন এগিয়ে আসছে বলে প্রত্যেকে অনুভব করেছে।

কিন্তু কোন উপায় নেই তাকে ঠেকাবার, তাকে এড়িয়ে পালাবারও কোন পথ নেই।

এই অভিশপ্ত বাড়িটির মধ্যেটি নিরুপায় ভাবে বন্দী কটি বাসিন্দার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্যই এ কাহিনীর অবতারণা।

সে কাহিনী কিন্তু, এ বাড়িতে যাঁরা স্বেচ্ছায় বা ভাগ্যের নির্দেশে একত্র হয়েছেন, বন্যায় জগৎ সংসার থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার কিছু আগে থাকতে সুরু করতে হবে।

শুধু বাড়িটির একটা পরিচয় বোধহয় পূর্বেই দেওয়া যেতে পারে।

বাড়িটি একটি হোটেল, কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে যার বিজ্ঞাপন তখনকার কাগজে দেখেছেন বলে কারুর কারুর হয়ত মনে পড়তে পারে। মনে পড়ার আর একটা কারণ এই যে স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপিত বিবরণে এমন একটু অভিনবত্ব ছিল সাধারণতঃ যা চোখে পড়ে না।

সেই অভিনবত্বটুকুই কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের অভিশপ্ত হয়ে ওঠার মূল, এমনও হতে পারে।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস পুরাণো নাম করা কোন হোটেল নয়। এ কাহিনীর যখন সূত্রপাত তার মাত্র কিছুদিন আগে তার পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেয়।

যতদূর জানি এ কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যনিবাসটিরও

অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। খবরের কাগজে অন্ততঃ তার অভিনব বিজ্ঞাপন আর চোখে পড়ে না।

অসাধারণ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে লোমহর্ষণ একটি বিভীষিকাময় রহস্য নাট্যের সাময়িক মঞ্চ হবার জন্যই যেন স্বাস্থ্য নিবাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ক্ষণ-পরমায়ু নিয়ে।

রোমাঞ্চকর রহস্য নাট্যের পরিসমাপ্তির সঙ্গে কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্য নিবাসের ওপরও শেষ যবনিকা পড়েছে।

কল্যানেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসে যে নাটক কেন্দ্রীভূত তার প্রথম দৃশ্য উন্মোচন করতে বরাকরের নদীতীর থেকে বহুদূরে কোলকাতার এক নোংরা শহরতলির একটি জন বিরল রাস্তায় যেতে হবে।

রাস্তাটি এমনিতেই নির্জন, তার ওপর কদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নালা নর্দমা বন্ধ হবার দরুণ জলে জলাকার হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে পারতপক্ষে কেউ আর ঘর ছেড়ে সেখানে বার হয় না। বাদলার স্তিমিত আলোয় সমস্ত অঞ্চলটা যেন পরিত্যক্ত শ্মশান পুরী বলে মনে হয়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বৃষ্টির কিন্তু এখনো বিরাম নেই। কখনো মুষলধারে কখনো ঝিরি ঝিরি তা পড়ছে ত পড়ছেই।

এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় জল ঠেলতে ঠেলতেই একটি মাত্র লোককে দৃঢ় মন্থর পদে যেতে দেখা গেল।

লোকটির চেহারা কি রকম বোঝবার উপায় নেই। পোষাক এই বৃষ্টি বাদলার উপযুক্ত হ'লেও একটু অদ্ভুত, চোখের কালো গগল্‌সটা

অন্ততঃ। এই বাদলার ঝিমোনো আলোয় কাউকে চোখ ঢাকা গগল্‌স্ পরে থাকতে দেখলে বিস্মিতই হ'তে হয়।

কালো রঙের মিলিটারি গোছের বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ লোকটির ঢাকা। মাথায় গাল ঢাকা টুপিটা তার ওপর যে ভাবে গগল্‌স পরা চোখ পর্যন্ত নামানো তাতে বর্ষাতির তোলা কলারের ওপর দিয়ে লোকটির মুখের কিছু দেখাই যায় না। এই আবছা আলোয় ত নয়ই, উজ্জ্বল দিবালোকেও ওই পোষাকের ভেতর দিয়ে মানুষটিকে চেনা অসম্ভব।

আকারেও মানুষটি সাধারণ. বেশী লম্বা বা বেঁটে নয়। ওই মাঝারি রকম গড়ন যে কোন বয়সের লোকের হ'তে পারে। মন্থর হলেও শুধু চলার দৃঢ় পদক্ষেপে লোকটি যে বেশ শক্ত সমর্থ তা বোঝা যায়।

একটা রাস্তার মোড় ঘুরে লোকটি সঙ্কীর্ণতর গলিতে ঢুকল। ঢোকবার মুখেই টিনের প্লেটে গলির নামটা লেখা। গিরিমাঝি লেন।

গিরিমাঝি লেনও এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় একেবারে নির্জন।

কয়েকটি বাড়ি ছাড়িয়ে লোকটি একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে যে রকম দ্বিধায় কড়া নাড়ল তাতে মনে হল বাড়িটা তার অচেনা নয়।

গিরিমাঝি লেন কলিকাতার একটি অতি পুরাতন আমলের পাড়া। অধিকাংশ বাড়িরই অত্যন্ত জীর্ণ দশা। লোকটি যে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছিল তার অবস্থা অন্যগুলির তুলনায় বুঝি বেশী শোচনীয়।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়বার পর প্রৌঢ় গোছের এক ভদ্রলোক একটা আধ খোলা ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—কাকে চান মশাই?

বর্ষাতি পরা লোকটির চেহারা শক্ত সমর্থ হলেও গলাটি তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ।

সে ধরা গলায় প্রায় ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে,—মোক্ষদা দেবী কি বাড়িতে আছেন ?

—আছে না আছে দেখুন না গিয়ে ওপরে ! প্রৌঢ় ফিরে যেতে যেতে ঝাঁঝালো গলায় আরও খানিকটা বকবক করে গেলেন—মোক্ষদা দেবী যেন দারোয়ান রেখেছেন আমায় তাঁর খবরদারী করতে !

বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলতে আসার জন্যে অত বিরক্ত এবং ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত না হলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক হয়ত বর্ষাতি পরা লোকটিকে আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেন। বাদলার আলোয় চোখের কালো চশমা আর ধরা গলায় কথা বলার ধরণটা অন্ততঃ তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করতে পারত।

কিন্তু সে সময়ে বিগড়ে যাওয়া মেজাজে এসব তিনি খেয়ালই করেন নি।

শুধু ছাতা মুড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকবার সময় কানটা আপনা থেকেই একবার বুঝি সজাগ না হয়ে উঠে পারেনি।

ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে কি রকম যেন একটা শিষ শোনা যাচ্ছে। যে লোকটাকে এইমাত্র দরজা খুলে দিলেন সেই ওপরে উঠতে উঠতে শিষ দিচ্ছে নাকি ?

এই বিদঘুটে বাদলায় বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কার শিষ দেবার সখ হয়, ভাবতে ভাবতেই প্রৌঢ় নিজের নিচের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই শিষ সেদিন আরো দুজন শুনেছিল।

একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আর তার সাকরেদ।

তখন বাদলার বিকেল সন্ধ্যেয় গড়িয়ে গেছে। একটা কারখানার সুইচ বোর্ডে কাজ শেষ করে দুজনে তখন বাড়ি ফেরার জন্যে যন্ত্রপাতি

গুছোচ্ছে। বড় মিস্ত্রী মুখে একটা বিড়ি গুঁজে দেশলাই বার করে দেখছে তাতে কাঠি আর নেই।

সাকরেদের কাছে কাঠি চাইতে সে প্রথমে লজ্জায় মাথা চুলকে শেষে ওস্তাদের ধমকে পকেট থেকে দেশলাই এর বাক্সটা বার করে দিয়েছে। সে বাক্সেও কাঠি মাত্র একটা। সে কাঠি স্যাঁৎসেঁতে হয়ে অনেক ঘষাঘষিতে ও আর জ্বলে নি।

সে কাঠি সেদিন জ্বললে দিগন্তব্যাপী জলের পাথারে নিঃসঙ্গ একটি অভিশপ্ত বাড়ির রোমাঞ্চকর রহস্যভেদের কোন সূত্রই বোধহয় কেউ পেত না।

হতাশ হয়ে অচল কাঠিটা ফেলে দেওয়ার সঙ্গে বড় মিস্ত্রী আর সাকরেদ রাস্তায় একটা শিষের শব্দ শুনে একটু চমকেই উঠেছিল।

এই বাদলার সাঁঝে শিষ দিয়ে রাস্তা হাঁটে আবার কে?

পর মুহূর্তে কারখানার আধখোলা গেটের ফাঁকে বাইরের রাস্তায় ওয়াটার প্রুফে ঢাকা সেই অদ্ভুত মূর্তিকে পায়ে হেটে যেতে দেখা গিয়েছিল।

বড় মিস্ত্রী আর তার সাকরেদ দুজনেই বিনা বাক্য ব্যয়ে বাইরে ছুটে বেরিয়েছিল।

অন্য কিছুর জন্যে নয় শুধু একটা দেশালইএর কাঠি পাবার আশায়।

পরের দিন সেই পাড়ার থানায় বড় মিস্ত্রী আর তার সাকারেদকেই বসে থাকতে দেখা গেল। কথাবার্তায় বোঝা গেল পুলিশের তলবে নয় তাঁরা নিজে থেকেই পুলিশের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছেন। সকাল বেলা খবরের কাগজে গিরিমাঝি লেনের খুনের কথা পড়েই বড় মিস্ত্রী পঞ্চুবাবুর টনক নড়েছে। সাকরেদ রাধেশকে নিয়ে তাই কর্তব্যের খাতিরে পুলিশকে তাঁদের সন্দেহের কথাটা জানাতে এসেছেন।

থানার ইনস্পেক্টর মিঃ চৌধুরী খানিকক্ষণ বড় মিস্ত্রী পঞ্চুবাবু ও তাঁর সাকরেদের এলোমেলো বিবরণ শুনে বুঝলেন যে নিজে থেকে সাহায্য না করলে সে বিবরণের জট ছাড়িয়ে আসল খবর কিছু পাওয়া যাবে না। বিবরণ শুনতেই ঘন্টা কাবার হয়ে যাবে।

সাক্ষাৎটা তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটার চেহারার একটু বিবরণ দিতে পারেন ?

চেহরার বিবরণ ? পঞ্চুবাবুকে বিব্রত মনে হল।

ইনস্পেক্টর সাহেবের চেয়ারের পাশে সার্জেন্ট গুপ্তও দাঁড়িয়ে সমস্ত বিবরণ শুনছিলেন। তিনি আরো একটু বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললেন,-- মানে—আপনারা যা লক্ষ্য করেছেন তাই একটু বলুন।

এ ব্যাখ্যাতেও কোন ফল হল না।

পঞ্চুবাবুর মাথায় টাক ও কাঁচা পাকা গোঁফ দেখলে বেশ ভরিক্কি গম্ভীর বলেই মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা একেবারে ছেলেমানুষের মত যেমন এলোমেলো তেমনি কমা দাঁড়ি বিহীন।

লক্ষ্য করব কি মশাই ?—পঞ্চুবাবু যেন পুলিশের অন্যায় আবদারে ক্ষুন্ন হয়ে বললেন—চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পেতাম নাকি ?

একে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে, তার ওপর লোকটার সর্বাঙ্গ ওয়াটার প্রুফে আর বর্ষাতি টুপিতে ঢাকা। চোখের গগল্‌স্‌ টাই যা অদ্ভুত লেগেছিল। না রাধেশ?

রাধেশের বয়স অল্প। রোগা পাকানো চেহারা। তার পরণে খাকি হাফ্‌ প্যান্ট আর শার্ট কিন্তু এমন ঝলঝলে যে মনে হয় যেন কারুর কাছে ধার করে আনা। থানায় এসে যে একটু ঘাবড়ে গেছে তা তার ঘন ঘন ঢোক গেলা থেকেই বোঝা যায়।

প্রশ্নটার চট্‌ করে সে জবাব দিতে পারে না। আজ্ঞে হ্যাঁ. শব্দটা বার করতেই ঢোক গেলার সঙ্গে তার কণ্ঠার ঠেলে ওঠা ডেলাটা বার দুই তিন নামা ওঠা করে।

মিঃ চৌধুরী একটু অধৈর্যের সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করবার জন্যে বললেন—

—"আচ্ছা ব্যাপারটা তাহলে এই। আপনারা বিনয় সরকার স্ট্রীট আর গিরি মাঝি লেনের মোড়ে ইলেকট্রিক লাইনটা মেরামত করছিলেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন যে দেশলাই-এর কাঠি নেই..."

মিঃ চৌধুরীর বিবরণ সংক্ষেপ করা আর হয়ে উঠল না।

পঞ্চুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—"রাধেশের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে দেখি তারও একটি কাঠি মাত্র সম্বল। বৃষ্টিতে এমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে যে ধরানই গেল না। ঠিক তখন ওয়াটার-প্রুফ-ঢাকা এক ভদ্রলোক গিরি মাঝি লেন থেকে বেরিয়ে আসছেন। গায়ে যখন ওরকম দামী ওয়াটারপ্রুফ তখন তাঁর পকেটে একটা দেশলাই থাকবে না এমন কি আর হতে পারে! আমাদের সামনে দিয়েই ভদ্রলোক শিষ দিতে দিতে যাচ্ছেন, আমি তখন..."

মিঃ চৌধুরী এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দিয়ে বললেন,—"থামুন থামুন! ঘটনাটা সবই আমাদের জানা আছে। আপনি দেশলাই

চাইতে তিনি দেশলাই বার করে দিলেন। আপনি সিগারেট ধরিয়ে ফেরত দিতে গিয়ে দেখেন, দেশলাই না নিয়ে তিনি চলে গেছেন। বৃষ্টি আর সন্ধ্যার অন্ধকারের দরুণ আপনারা তাঁর গায়ের ওয়াটারপ্রুফ, মাথা-ঢাকা টুপি আর চোখের গগ্‌ল্‌স ছাড়া কিছু লক্ষ্য করেন নি..."

"লক্ষ্য করবার কথা যে মনেই হয়নি ছাই!"—টাক-মাথা ভদ্রলোককে আর বুঝি থামান যাবে না—"দেশলাই পেয়েই তখন বর্তে গেছি। সিগারেট ধরাতে গিয়ে নজর ত আর তাঁর দিকে নেই। তিনি যে দেশলাইটা ফেলেই চলে যাবেন ভাবতেই পারিনি। তখন এই রাধেশটাও যদি একবার বলে

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বললেন—"রাধেশই বা জানবে কি করে বলুন যে লোকটির চেহারাটা লক্ষ্য করা দরকার। শুনুন—চেহারা আপনারা লক্ষ্য করেন নি যখন, তখন তার আর চারা নেই। কিন্তু লোকটি কি করে শিষ দিতে দিতে যাচ্ছিল কিছু মনে আছে? কোন সুর-টুর কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাঁড়ান দাঁড়ান!"—টাক-মাথা চুলকে ভদ্রলোক বললেন, "খুব একটা চেনা সুর! কি বলে একটা ফিল্মের গানই হবে যেন। কি হে রাধেশ, মনে পড়ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—রাধেশ যেন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে স্বীকার করলে।

মিঃ চৌধুরীর ও সার্জেন্ট গুপ্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। টাক-মাথা ভদ্রলোক আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে মিঃ চৌধুরী রাধেশকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি সুর আপনার মনে আছে?"

রাধেশ বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সুর সবাই জানে।"

"সবাই জানে মানে!"—মিঃ চৌধুরী অবাক।

"আজ্ঞে, 'মনের মানুষ' ছবির গানের সুর কি-না! ও গান কে না শুনেছে!" রাধেশ এতক্ষণে একটু সহজভাবেই কথা বললে।

মিঃ চৌধুরী নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হলেন মনে হল। গান শোনা দূরে থাক, 'মনের মানুষ' ছবিটার নামটাও তাঁর জানা নেই। সার্জেন্ট গুপ্তর দিকে চেয়ে কিন্তু তাঁর কেমন সন্দেহ হল, এ ছবি তাঁর অদেখা নয়। গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে গুপ্ত, 'মনের মানুষ' না 'বনের মানুষ' গোছের কোন ছবি দেখেছ নাকি?"

সার্জেন্ট গুপ্ত যথাসম্ভব বিরাগের ভাণ করে বললেন—হ্যাঁ স্যার, একটা ছবি যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে ত আগাগোড়াই গান।"

মিঃ চৌধুরী আবার রাধেশের দিকে ফিরলেন,—"কোন্ গান কিছু বলতে পারেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই হিরোইনের মুখের থার্ড গানটা!"—রাধেশের সাহস অনেকখানি বেড়েছে বোঝা গেল,—"ওই যে গানটার ফার্স্ট লাইন হ'ল, "কাছে থাকে তবু চিনি না।"

"কাছে থাকে তবু চিনি না!'—মিঃ চৌধুরী ক' সেকেণ্ড কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন,—"আচ্ছা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। খবরের কাগজে গিরি মাঝি লেনের খবর পড়ে আপনারা নিজে থেকে এই ব্যাপার টুকু যে জানাতে এসেছেন তার জন্যে সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।"

টাক-মাথা ভদ্রলোক এতক্ষণ রাধেশের একটু পেছনে পড়ে গেছলেন, এবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে আবার একটু জাহির করলেন,—"আজ্ঞে রাধেশ ত ভয়ে আসতেই চায় না। আমি জোর করে নিয়ে এলাম। যেমন তেমন ব্যাপার ত নয়, যাকে বলে খুন! তাই আমি।"

মিঃ চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন,—"তাই আপনি ঠিক উচিত কাজ করেছেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

টাক মাথাকে নমস্কার করে এবার উঠে দাঁড়াতে হল। কিন্তু শেষ বাহাদুরীটা তিনি না নিয়েই ছাড়লেন না।

পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটি জিনিস বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন,—"এটিও আপনাদের কাজে লাগতে পারে বলে নিয়ে এসেছি!"

মিঃ চৌধুরী সবিস্ময়ে বললেন,—"কি ওটা?"

"আজ্ঞে সেই দেশলাইয়ের বাক্সটা! অপরাধ নেবেন না, না জেনে ওর কটা কাঠি কিন্তু খরচ করে ফেলেছি।"

মিঃ চৌধুরী হাসি চেপে বললেন,—, "না তাতে কি হয়েছে! কিন্তু কাগজে মোড়া কেন?"

"আজ্ঞে আপনাদের ওই যে কি বলে ফিঙ্গার-প্রিণ্ট-টিণ্ট যদি কিছু থাকে! তাই ওই কাগজটাতেই মুড়ে নিয়ে এলাম। কাগজটাও সে লোকটার পকেট থেকে পড়ছিল কিনা!"

"কোন কাগজটা!"—মিঃ চৌধুরী সত্যিই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি টান হয়ে বসলেন।

"আজ্ঞে ওই যে কাগজটায় মুড়ে এনেছি। দেশলাই বার করতে গিয়ে সে লোকটার পকেট থেকে পড়ে যায়। আমি দেখিনি। রাধেশ সিনেমায় বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন ভেবে কুড়িয়ে নিয়েছিল।"

মিঃ চৌধুরী ততক্ষণে কাগজের মোড়কটা খুলে তাঁকে আবার হতাশই হতে হয় বোধহয়। ভেতরে একটা টেক্কা মার্কা দেশলাইয়ের বাক্স, আর কাগজটা সত্যিই একটা সাধারণ হ্যাণ্ডবিল।

তবু রাধেশকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"কাগজটা সেই লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল ঠিক দেখেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দেশলাই বার করতে গিয়ে কাগজটা পড়ে গেল। পঞ্চুদা তখন সিগারেট ধরাচ্ছেন আর আমি যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে ভরছি। লোকটা অমন হঠাৎ চলে যাবার পর…"

টাক-মাথা পঞ্চুদা মূল-গায়েনের পদ আর রাধেশকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তিনিই আবার শুরু করলেন,—"আমি বললাম,—আরে দেশলাইটা না নিয়েই চলে গেল যে! রাধেশ তখন কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখছে। বললাম,—দে দে। পকেটটা ত ভিজে গেছে। শুকনো কাগজটায় মুড়ে রাখি। ভাগ্যিস রেখেছিলাম।"

পঞ্চুদার আগের সঙ্গে এখনকার বিবরণের তফাৎটুকু মিঃ চৌধুরী আর ধরিয়ে না দিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন,—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বুদ্ধি করে যে রেখেছিলেন, তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার।"

নমস্কার করে পঞ্চু-দা ও তাঁর সাকরেদ বিদায় নেবার পর চেয়ারে একটু ক্লান্তভাবে হেলান দিয়ে মিঃ চৌধুরী বললেন—

যাই হোক একটা জিনিস কিন্তু জানা গেল। শিষ-এর সুরটা। গিঃ মাঝি লেনের সেই বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকও শিষ শোনার কথা বলেছেন। পোষাকটা যে ভাবে মিলে যাচ্ছে দুজনার বর্ণনায়, তাতে একই লোককে যে এরা দেখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি এই শিষ দিয়ে গানের সুর ভাঁজায়। সবেমাত্র ওই রকম একটা পৈশাচিক খুন করে এসে শিষ দিয়ে কেউ গানের সুর ভাঁজতে পারে? তাও একটা সস্তা ফিল্মের গানের সুর।"

"ভেবে দেখুন স্যার, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি!" সার্জেন্ট গুপ্ত মাথা চুলকে বললেন'—মোক্ষদা ঠাকরুণ ব'লে যাঁকে গলায় ওয়াটার প্রুফের বেল্টের ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর সমস্ত খবর নেওয়া হয়েছে। কোনও শত্রু কোথাও তাঁর ছিল ব'লে কেউ অন্ততঃ জানে না। ভদ্রমহিলার সেকালের শিক্ষিত পরিবারে জন্ম। যতদূর জানা গিয়েছে তার স্বামী এককালে একটি অনাথাশ্রম চালাতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সে কাজ বহুদিন ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িটি নিজে নিয়ে দিনের বেলা একটি সেলাই-ফোঁড়াই-এর স্কুল চালান। স্বামী যা রেখে গেছেন

তার সঙ্গে এই আয়ে তাঁর একরকম চলে যায়। নেহাত উন্মাদ না হলে কেউ এভাবে তাঁকে মারতে পারে—এটা কল্পনা করা যায় না।"

মিঃ চৌধুরী খানিক চুপ করে কি যেন ভাবছেন মনে হ'ল। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—"না উন্মাদ হলেও সাধারণ উন্মাদ নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছে বলেই মনে হয়। মোক্ষদা দেবী যে সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ ওপরে একেবারে একা থাকেন, নিচে ঝি ছাড়া আর তেমন কেউ যে তখন বাড়িতে থাকে না, এ-সব মনে হয় খুনী আগে থাকতেই খবর নিয়েছে। তার পোশাক ও চালচলন থেকে যেটুকু জানা গেছে তাতে পাগলামির কোন সন্দেহ সহজে করা যায় না। তাছাড়া বদ্ধ উন্মাদ হলেও তার একটা হদিস এ দুদিনে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কোন উন্মাদাশ্রম থেকে ওরকম কেউ পালিয়েছে বলে এখনও ত জানা যায়নি।"

"আমি সে রকম উন্মাদের কথা বলছি না স্যার। সাধারণ স্বাভাবিক চেহারার মানুষের ভেতরই কখনো কখনো ওরকম উন্মাদের লক্ষণ ত প্রকাশ পায়।"—সার্জেন্ট গুপ্ত একটু সঙ্কুচিতভাবে নিজের মতটা জানালেন,—"অকারণে যাকে তাকে খুন করা তখন নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়।"

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বললেন,—"ও রকম খুনে বানানো গল্পেই দেখা যায়। তা ছাড়া আগেই যা বললাম,—খুনী-মাত্রেই এরকম পাগল হলেও, there is method in his madness বেশ প্ল্যান করা ব্যাপার। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কোন খেই যে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হঠাৎ কি ভেবে তিনি যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—'দাঁড়াও দাঁড়াও। দেশলাই মোড়বার কাগজটা লোকটার পকেট থেকে পড়ে গেছল বললে না?"

"হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ওটা ত একটা সাধারণ হ্যাণ্ডবিল।"

'হ্যাঁ সাধারণ হ্যাণ্ডবিলই বুঝলাম, কিন্তু এটা সে যত্ন করে পকেটে রেখেছিল কেন?"

"যত্ন করে যে রেখেছে তাই বা কি করে বুঝছি।"—সার্জেণ্ট গুপ্ত সবিনয়ে হলেও প্রতিবাদ না করে পারেন না,—"হয়ত আমরা সবাই যেমন করি তেমনি রাস্তার কারুর কাছে পেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে রেখে দিয়েছে।"

যুক্তিটা অগ্রাহ্য করবার নয়। তবু মিঃ চৌধুরী কাগজটা আর একবার ভাল করে পড়ে বলেন,—"বিজ্ঞাপনটা কিসের দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, একটা হোটেলের হ্যাণ্ডবিল। কোথায় বাইরে কোন স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপন।"

মিঃ চৌধুরী চিন্তিত ভাবে বলেন,—"সেই জন্যেই ওই লোকের পকেটে থাকাটা একটু অদ্ভুত লাগছে না?"

বিজ্ঞাপনটা তিনি জোরে জোরে পড়েন এবার,—"কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস। মনোরম পরিবেশ বরাকর নদীর তীরে অত্যন্ত স্বাস্থ্য কর স্থানে বৈদ্যুতিক আলো টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত নাগরিক সুখ সুবিধা সমেত আধুনিক হোটেল। মধ্যবিত্তের সুবর্ণ-সুযোগ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। নিজস্ব গাড়িতে ষ্টেশন হইতে হোটেলে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা।"

বিজ্ঞাপনটা পড়ে মিঃ চৌধুরী সার্জেণ্ট গুপ্তর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান।

"এ হ্যাণ্ডবিলের কোন তাৎপর্য নেই বলছ?"

"কিছু হয়ত থাকতে পারে।"—সার্জেণ্ট গুপ্তকেও একটু ভেবে বলতে হয়,—"হয়ত কোনো দিন এই লোকটি সেখানে ছিল, কিংবা হয়ত এ খুনের পর গা ঢাকা দেবার জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেখে জায়গাটার কথা ভেবেছে। কিন্তু সেখানেই যে সে যাবে বা কখনো গিয়েছিল তা ঠিক কি? এ বিজ্ঞাপন থেকে কোন সুবিধে আমাদের হচ্ছে কি এখন?"

"না তা হচ্ছে না।"—ব'লে কাগজটা আবার টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ চৌধুরী চমকে উঠলেন। বিজ্ঞাপনের উল্টোদিকের সাদা

পিঠটা চোখের কাছে এনে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে খানিকটা দেখে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন,—শীগ্‌গির বরাকর পুলিশ-ষ্টেশনকে ফোনে ধরো। আর দেখো ডি সি ইসমাইল সাহেবকেও কোথাও পাও কিনা।"

সার্জেণ্ট গুপ্ত হঠাৎ এই আদেশে একটু হতভম্ব হয়ে বললেন, "কেন, কি হ'ল স্যার?"

চৌধুরী অধৈর্যের সঙ্গে বলেন,—"আগে তুমি ফোনটা লাগাও ত, পরে বলছি।"

বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি বোধহয় খানিকটা মার্জনীয়।

বিজ্ঞাপনের বিশেষণের সঙ্গে আসল জিনিসের পরিচয় অনেক সময়েই মেলে না এটা আমরা ধরেই নিই। কিন্তু কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের বেলা এই সাধারণ নিয়মের সত্যিই একটু ব্যতিক্রম বোধ হয় দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন যে-ই লিখে থাকুক, স্বাস্থ্যনিবাসটির পরিচয় দিতে বাড়াবাড়ি অন্ততঃ কোথাও করেনি।

বরাকর নদীর ধারেই সত্যিই মনোরম পরিবেশে প্রথম ইংরেজ আমলের থামওয়ালা বেশ বড় একটি বাড়ি।

ঢেউ-খেলানো রাঙামাটির দেশ। দূরে ছোট-খাট পাহাড়ও দেখা যায়। জায়গাটির সবচেয়ে বড় আর্কষণ তার নির্জনতা। ধারে-কাছে সাত-আট মাইলের মধ্যে একটা দুটো চাষীদের কুঁড়ে ছাড়া কোনো বসতি নেই।

স্বাস্থ্যনিবাসটির মনোরম পরিবেশ আপাততঃ অবশ্য আবিষ্কার করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচ দিন ধরে একনাগাড়ে ঝড়-বৃষ্টি চলেছে। মাঠঘাট জলে জলময়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চারিদিক এমন ঝাপসা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত।

একটিমাত্র যে পাকা রাস্তা দূরের বরাকর শহর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসটির সংযোগ রক্ষা করে, তা ইতিমধ্যেই নানা জায়গা বর্ষার জলের স্রোতে প্রায় অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাকর নদীর জল তার ওপর যে রকম বেড়ে কূল ছাপাবার উপক্রম হয়েছে, তাতে বন্যা হলেই সর্বনাশ।

বরাকর থেকে ভাড়া-করা মোটরে স্বাস্থ্যনিবাসে আসতে-আসতে কণিকা সেই কথাই ভাবছিল।

রাস্তায় এর মধ্যেই দু জায়গায় আটকে যেতে হয়েছে। মাঠের জল নদীর স্রোতের মত রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে। মোটরের ভেতর পর্যন্ত জল উঠে ইঞ্জিন গেছে বন্ধ হয়ে।

কোনো রকমে ঠেলে ঠুলে মোটরটাকে সেই জলের স্রোতে পার করে নিয়ে গিয়ে আবার চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ড্রাইভারকে। নেহাত মেয়েছেলে সওয়ারী বলেই সশব্দে সে নিজের বিরক্তি বোধহয় প্রকাশ করেনি। কিন্তু রামসেবকের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে এক-কোমর জলে মোটর ঠেলবার সময় মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়েছে নিশ্চয়, এমন দিনে এ রকম ভাড়া জুটিয়ে দেওয়ার জন্যে।

হোটেলে এতক্ষণ কি হচ্ছে তাই বা কে জানে।

ভোর-বেলাতেই স্বামী স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে কুল্‌টি চলে গেছেন স্টেশন থেকে গোটাকতক পার্শেল খালাস করে আনবার জন্যে।

দশটার ট্রেনে একজন বোর্ডারের আসবার কথা। তাঁকেও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বেলা দুটো পর্যন্ত স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে কণিকা নিজেই ফোন করে বরাকর থেকে ভাড়াটে গাড়ি আনিয়ে বরাকর গিয়েছিল কয়েকটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস কেনার সঙ্গে বাজারটাও সেরে আসবার জন্যে।

তখন বৃষ্টিটা যেন একটু ধরবার আশা দেখা দিয়েছিল। বাইরের পথ ঘাটের চেহারা যে কি হয়েছে তাও ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি।

বেরুবার পর থেকে ঝড় ও বৃষ্টি দুই-ই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। বরাকরে কি কষ্টে যে বাজার সেরেছে সে-ই জানে!

দূরে নির্জনে স্বাস্থ্যনিবাস খোলার সুবিধে যেমন, দায়ও ত তেমনি দারুণ। এখন হোটেলের প্রত্যেকটি জিনিস বয়ে এনে মজুত না রাখলে নয়।

খরা শুখনোর সময় তেমন কোনো ঝামেলা নেই। ফোন করে দিলেও দু-একটা বড় দোকান সব জিনিষপত্র গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে উপরি ভাড়া শুধু ধরে নেয়। কিন্তু এই দুর্যোগে সে দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী নয়। কণিকাকে তাই নিজেকেই আসতে হয়েছে।

নিজেকে আর কোন্ কাজটা না তাকে দেখতে হয়।

স্বামী অলস কি অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু কেমন একটু অগোছালো অন্যমনস্ক। কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

এই আজকেই ষ্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে কি গোল বাধিয়েছেন কে জানে!

কিন্তু এই দুর্যোগ এইভাবে চললে তাদের ব্যবসার যে দফা রফা।

পূজোর পর এই সময়টাই এ-ধরণের স্বাস্থ্যনিবাসের মরশুম। এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনজন বোর্ডার এসেছেন। আর জন-কয়েকের আজকের মধ্যে আসবার কথা, তাঁরা কেউ এসে পৌঁছতে পারবেন বলে ত ভরসা হয় না।

যে তিনজন ইতিমধ্যে এসেছেন তাঁদের যত্নের ত্রুটি অবশ্য যাতে না হয় তার ব্যবস্থা সে প্রাণপণে করতে প্রস্তুত।

এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে নইলে বরাকরে বাজার করতে আজ সে বেরুত না।

কিন্তু তাতেই কি তাঁদের সন্তুষ্ট করা যাবে?

প্রথম নতুন স্বাস্থ্যনিবাসে এসে তাঁরা খুব ভাল ধারণা নিয়ে যাবেন বলে মনে হয় না।

অথচ বাইরের বিজ্ঞাপনের চেয়ে যাঁরা নিজেরা থেকে গেছেন তাঁদের মতামতের দামই যে এ ব্যবসাতে বেশী তা কণিকা ভাল করেই বোঝে।

এখানে স্বাস্থ্যনিবাস করবার পরিকল্পনাটা তাই।

লাহিড়ী প্রথমে ত কথাটাকে আমলই দিতে চায় নি।

"তুমি পাগল হয়েছ কণিকা! স্বাস্থ্যনিবাস মানে হোটেল করা কি চারটিখানি কথা! বিশেষ করে বাংলার ভেতরে ওই বেপোট জায়গায় লোকে পয়সা খরচ করে থাকতে যাবে কেন? রাঁচি হাজারিবাগ পুরী না যাক, তারা অন্ততঃ মধুপুর যশিডি যাবে।"

"তেমন স্বাস্থ্যনিবাস করলে এখানেও যাবে। আর বাংলার ভেতরে বলেই ত আরো যাওয়া উচিত"—কণিকা যুক্তি দেখিয়েছে,—"বাংলার ভেতরে ভালো স্বাস্থ্যনিবাস কেউ কোথাও করেছে। আছে ত যাবার জায়গা ওই এক দীঘা। সেখানেও আমাদের মত সুবিধে পাবে কোথায়?"...

কণিকা যে সুবিধের কথা বলেছে সেটা এরকম জায়গায় একটু দুর্লভ সন্দেহ নেই।

আগেকার এক বিদেশী কয়লার খনির ইংরেজ ম্যানেজারের প্রাণে একটু কবিত্ব ছিল বোধহয়। এই নির্জন জায়গায় ছোটখাট একটি বিলিতী ধরণের বাড়ি তিনি কোম্পানির পয়সাতেই বানিয়েছিলেন, কোম্পানির যারা ম্যানেজার হবে তাদের থাকবার জন্যে।

তখন কয়লার খনিতে ধুলোমুঠো সোনা হচ্ছে। সৌখীন ম্যানেজার বাড়িটিতে বিজলী-বাতি টেলিফোনের বন্দোবস্ত ত করেইছিলেন, তার ওপর বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে আসবার একটা নিজস্ব রাস্তাও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন।

কিছুকাল আগে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে সে কোম্পানি লাটে উঠেছে। সে কোম্পানির পাত্তাড়ি গুটোবার ভার যাদের হাতে তারা কোম্পানির

অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে বাড়িটি বিক্রির চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যবসার হাল-চাল ও অঞ্চলে তখন বদলে গেছে। শুধু কবিত্বের খাতিরে অত দূরের অতবড় বাড়ি কেনবার গরজ কারুর হয়নি।

নতুন মুরুব্বিদের বাধ্য হয়েই তারপর বাড়িটি ভাড়া দেবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। সে বিজ্ঞাপনে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বাড়ি ভাড়ার পরিমাণও তাই ক্রমশঃ কমে এসেছে। এই সময়ে কণিকার স্বামী প্রবীর লাহিড়ার-ই একদিন বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে।

"দেখেছ কণিকা দুটো ঘরের জন্যে আমরা হা-পিত্যেশ করে মরছি, আর বড় বড় দশখানা শোবার-ঘর হল বৈঠকখানা রান্নাঘর নিয়ে গোটা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে।"

"কোথায়, কোথায়?"—বলে কণিকা উদ্‌গ্রীব হয়ে স্বামীর হাতের কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

একটু মজা করবার জন্যেই প্রবীর কথাটা বলেছিল। কণিকার করুণ ব্যাকুলতা দেখে কিন্তু মায়া হয়েছে তার। তাড়াতাড়ি হেসে বলেছেন,—"আরে না, ঠাট্টা করছিলাম। এ-বাড়ি হ'ল জনমানবহীন তেপান্তরে। নইলে অত বড় বাড়ি মাসে একশ টাকা ভাড়া হিসেবে লীজ দিতে চায়।"

কণিকার আগ্রহ কিন্তু তাতেও কমে নি। প্রবীরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞাপনটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কি ভেবেছে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে,—"তুমি চিঠি লেখ এখুনি। ও-বাড়ি আমরাই ইজারা নেবো।"

"মানে?"—কলিকাতা শহরে বাসার খোঁজে হয়রান হয়ে স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়েছে বলেই প্রবীরের সন্দেহ হয়েছে।

"মানে ওই বাড়িতেই আমরা থাকব—আর, আর—"কণিকা একটু দ্বিধা করে, তারপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বলেছে,—"ওখানে হোটেল-মানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস করব নতুন ধরণের।"

তারপর যে তর্ক হয়েছে তার আভাস আগেই কিছুটা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কণিকা কিন্তু প্রবীরকে এ-পরিকল্পনায় সায় দিতে বাধ্য করেছে নানান যুক্তিতে।

যুক্তিগুলো তাদের তখনকার অবস্থার দরুণই অকাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবীরের পক্ষে।

প্রথমতঃ, দেড় বছর আগে আকস্মিকভাবে বোম্বাই শহরে বিয়ে হবার পর থেকে তারা দুজনে দেশে ফিরে এতদিনেও একটা মনের মত বাসা সংগ্রহ করতে পারেনি।

কোনো একটি হোটেলেই তারা সেই কারণে একটা কামরা নিয়ে আছে।

দ্বিতীয়তঃ বিয়ের পর কণিকার কথায় মার্চেন্টনেভির চাকরি ছাড়া অবধি দেশে প্রবীর কোনো কাজ যোগাড় করতে পারে নি।

. প্রবীরের অবস্থা এমনিতে অবশ্য ভালো। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা ছেলেবেলায় মারা গেছেন। কিছুদিন আগে সদাগরী জাহাজে অষ্ট্রেলিয়ায় থাকার সময়ই পিতার মৃত্যুর খবর সে পেয়েছে। অন্য কিছু না রেখে যান প্রবীরের বাবা, মোটা একটা ইনসিওরেন্সের টাকা ছেলের নামে লিখে গেছেন। চাকরি না থাকলে সুতরাং তার আর্থিক দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই।

এর ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে ধনী এক মাতামহের উইলে সম্প্রতি কণিকার বেশ ভালোরকম একটা মাসোহারার ব্যবস্থা হওয়ায় এদিক দিয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কাজ না করে চুপ করে বসে থাকা যে পুরুষের পক্ষে ক্ষতিকর এটা কণিকা কিছুদিন ধরে ভালো করেই বুঝতে পারছে।

বরাকরের ধারে গিয়ে একটা স্বাস্থ্যনিবাস-গোছের গড়ে তুললে তাদের রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হ'য়ে অনেক সমস্যাই এক সঙ্গে মিটে যায়।

নিজেদের চমৎকার থাকবার জায়গা ত মেলেই, সেই সঙ্গে প্রবীরও

করবার মত কাজ পায়, আর একা-একা অত দূরে থাকা যাতে একঘেয়ে না হয় সেই জন্যেই এমন কিছু সঙ্গীর ব্যবস্থা হয়, যারা নিজের পয়সা খরচ করে সঙ্গ দিতে আসবে।

না, সমস্ত সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। কণিকার আগ্রহে মাস-ছয়েকের মধ্যে বাড়ি লীজ নেওয়া থেকে স্বাস্থ্য নিবাসের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়ে, বিজ্ঞাপন হ্যাণ্ডবিল পর্যন্ত ছাড়া হয়ে গেছে।

তারপর কণিকাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন স্বাস্থ্য-নিবাস ঠিক খোলার দিন থেকেই এই দুর্যোগ।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের একটি বিশেষ নিয়ম কণিকা এই করেছিল যে, সাধারণ হোটেলের মত আজ এসে কাল সেখান থেকে চলে যাওয়া যাবে না। অন্ততঃ সাত দিনের কম কোনো বোর্ডারের সেখানে থাকবার নিয়ম নেই। মোট বোর্ডারের সংখ্যাও পরিমিত। তিনটি সিংগল-সীটেড ও ছটি ডবল-সীটেড ঘরে সবসুদ্ধ পনেরোজনের বেশী বোর্ডার কখনও নেওয়া হবে না—এই কণিকার ব্যবস্থা।

কণিকার পরিকল্পনা যে খুব আজগুবি, বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল ছাড়বার কিছুদিন বাদেই তা টের পাওয়া গেছে।

তিনজন চিঠি লিখে এক মাসের জন্য ঘর রিজার্ভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনে আবার অগ্রিমও টাকা পাঠিয়েছেন মনি-অর্ডারে।

যাঁরা চিঠি লিখে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন শেষ পর্যন্ত আসছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম বোর্ডার এসেছেন গত পরশু দিন।

বয়স্কা মহিলা। এক কালে বুঝি স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস ছিলেন। বিয়ে থা করেন নি, কিন্তু সাজ পোশাকে এখনো একটু বাড়াবাড়ি আছে। কথাবার্তা চালচলনে দুনিয়ায় কেউই যেন তাঁর সমকক্ষ নয় এমনি একটা অহঙ্কারের আভাস।

বৃষ্টি তখন তুমুল ধরে পড়ছে। ষ্টেশন ওয়াগনে অত্যন্ত সমাদর করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকেই তিনি কটু সমালোচনা শুরু করেছেন,—"ছিঃ ছিঃ, এমন জানলে আমি আগাম টাকা পাঠিয়ে এখানে আসি। শুনেছিলাম নদীর ধারে বাড়ি। সারা রাস্তাই ত দেখলাম নদী আর নালা!"

কণিকা কোনো রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করে তাঁর জন্যে বরাদ্দ ঘরে নিয়ে গেছে। ঘরের চেহারা দেখে খুঁত ধরবার মত তখুনি কিছু না পেয়ে তিনি বলেছেন,—"দেখুন, একটা কথা আপনাদের আগেই জানিয়ে দিই। খাবার দাবার যা খাওয়াবেন তা ত এই তেপান্তরের মাঝখানে জেলখানা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রত্যেক দিন চারবার করে আমায় চা দিতে যেন ভুল না হয়। একবার ভোর পাঁচটায়, তারপর সকাল সাতটায়, তারপর বিকেল তিনটেয়, আবার সন্ধ্যে ছ'টায়,। যান, টুকে রাখুন গিয়ে, পাঁচটা সাতটা তিনটে ছ'টায়।"

"আচ্ছা তাই হবে!"—বলে কণিকা চলে আসবার জন্যে ফিরতেই আবার পিছন থেকে ডাক পড়েছে,—" শোনো!"

কণিকা একটু বিরক্ত মুখেই ফিরে দাঁড়ালেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভদ্রমহিলা বলেছেন,—'তোমার মত ওই বয়সের মেয়েকে আপনি আজ্ঞে আমি বলতে পারব না। তবে তোমাদের পরিচয়টা একটু দরকার তোমার নামটা কি?"

"কণিকা।"

"গাড়িতে যিনি নিয়ে এলেন তিনি তোমার কে হ'ন?"—বিরক্তির সঙ্গে হাসিও পেয়েছে এবার কণিকার এই জেরার ধরনে! একবার ইচ্ছে হয়েছে বলে,—কেউ নয়, বন্ধু আর এই হোটেলের অংশীদার। তারপর অবস্থানে রসিকতার লোভ সংবরণ করে বলেছে,—"আমি ওঁর স্ত্রী।"

"ওঃ"—ভদ্রমহিলা যেন ওর অন্য কিছু আশা করেছিলেন, এই ভাবে বলেছেন,—"কত দিন বিয়ে হয়েছে?"

"বেশী দিন নয়"—বলে কথাটা এড়াবার জন্যেই কণিকা বলেছে,—"আপনার স্নানের গরম জল যদি লাগে ত বলুন, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু তবুও তখুনি নিষ্কৃতি মেলেনি।

"কি শীত, কি গ্রীষ্ম আমি ঠাণ্ডা জলে স্নান করি।"—বলে কণিকাকে যেন স্বাস্থ্য নীতি শিক্ষা দিয়ে ভদ্রমহিলা বলেছেন—"আমার নামটাও তোমার জানা দরকার। আমি মিস্ ধর, এক্স্ স্কুল-ইনস্পেক্ট্রেস, মজঃফরপুর। আমায় মিস্ ধর বলেই ডাকবে।"

"যে আজ্ঞে!"—বলে কণিকা সিঁড়ি দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে আসতে স্বাস্থ্যনিবাস চালানোর প্রথম অভিজ্ঞতায় বেশ একটু চিন্তিতই হয়েছে।

মিস্ ধরের পর সন্ধ্যেবেলা নিজেই ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছেন ডাঃ জনার্দন বাজপেয়ী।

বয়সে চল্লিশের চেয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ। একটু বেশী গম্ভীর। কথাবার্তা মনে হয় নেহাত দরকারে ছাড়া বলেন না। যখন বলেন তখন একটু অদ্ভুতই শোনায়।

প্রবীরই তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেছে। কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করায় মুখের পাইপটা নামিয়ে যা বলেছেন, তাতে প্রবীর প্রথমটা চমকেই গেছে।

ডাঃ বাজপেয়ী এক গ্লাস জল চাওয়ার মত বলেছেন—"একটু—শান্তি।"

প্রবীর একটু বিমূঢ় ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে তারপর হেসে ফেলেছে। বলেছে,—"আশা করি তা এখানে পাবেন।"

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখে হাসির কোনো আভাস দেখা যায়নি গম্ভীর ভাবে বলেছেন,—"আপনার কথাই সত্য হোক।"

নেমে এসো প্রবীর কণিকাকে সবিস্তারে সব শুনিয়ে বলছে—"স্বাস্থ্য নিবাসের বদলে উন্মাদাশ্রম নাম দেওয়াই বোধ হয় আমাদের উচিত ছিল। যা সব নমুনার আমদানি হচ্ছে।"

কিন্তু আরো এক নমুনা তখনও দেখতে বাকী।

তিনি এলেন রাত প্রায় ন'টার পর।

সারাক্ষণ সমানে বৃষ্টি পড়ছে।

মিস্ ধরের শরীর খারাপ বলে তাঁর খাবার তাঁর ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ বাজপেয়ী, প্রবীর ও কণিকা তিনজনে নিচের খাবার ঘরে একসঙ্গে বসে খেয়েছেন।

খাওয়া নামেই এক সঙ্গে, নইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের খোলসের মধ্যে ঢাকা। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো কথা হয়নি।

নিজেরা থাকলে কণিকা ও প্রবীর অবশ্য এভাবে চুপ করে নিশ্চয়ই থাকত না, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ীর গম্ভীর নীরবতার মর্য্যাদা রাখবার জন্যেই তাদেরও মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়েছে তাঁর শাস্তির বায়না মেটাতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঃ বাজপেয়ী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর ঘরে উঠে গেছেন। রামসেবককে টেবিল পরিষ্কার করবার হুকুম দিয়ে কণিকা ও প্রবীর তাঁদের নিজের ঘরে গিয়ে বসেছে।

এ ঘরটা নিচের তলায় তারা ইচ্ছে করেই নিজেদের জন্যে রেখেছে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘর কাছে হওয়ার দরুন কাজের সুবিধে হয় বলেই নয়, এখান থেকে গেট পার হয়ে বাইরের রাস্তা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় বলে।

এই বর্ষার রাত্রে অবশ্য সেখানে দেখবার কিছু নেই।

কাঁচের শার্সি বৃষ্টির জলের ছিটেতে ঝাপসা। গাড়ি-বারান্দার বাতিটার আলোয় ঝিকমিক করে বাইরে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির একটা পর্দা যেন শুধু দুলে দুলে নেমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে সিগারেটটায় টান দিয়ে প্রবীর কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে ব'সে সে বলেছে—"কে যেন আসছে না?"

ঝাপসা সার্সির ভেতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বাইরের বৃষ্টির ঝিকমিকে পর্দার ওপর দিয়ে কিছু একটা সরে গেল বলেই মনে হয়েছে।

কণিকা তাড়াতাড়ি উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেখান থেকে আর কিছু দেখা যায়নি।

পরক্ষণে বাইরের দরজার ভারী কড়া সজোরে নাড়ার শব্দ পাওয়া গেছে।

সত্যিই কেউ তাহলে এই দুর্যোগের মধ্যে এত রাত্রে এসে হাজির হয়েছে। কণিকা জানালার কাছে যাবার আগেই গাড়ি-বারান্দার তলায় সে পৌঁছে গেছে বলে বোধহয় কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু গাড়িটাড়ির কোনো শব্দও পাওয়া যায়নি। মানুষটা এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এরকম দুর্গম পথে এল কি করে?

এই কথাই ভাবতে ভাবতে কণিকা প্রবীরের সঙ্গে বাইরের হলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীর ভারী লোহার খিলটা নামিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার একটা দমকা বৃষ্টির ছাটে ভেতরের হলের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে।

আগন্তুক ভেতরে পা দিয়ে হাতের সুটকেসটা নামিয়েই প্রবীরের সঙ্গে দরজা বন্ধ করবার দুঃসাধ্য ব্যাপারে নিজে থেকে যোগ দিয়েছে।

প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করা সোজা ব্যাপার নয়। দুজন জোয়ান পুরুষকে বেশ নাজেহাল হতে হয় তা বন্ধ করে খিলটা লাগাতে।

কণিকা লোকটিকে এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে। দোহারা চেহারা,

মাঝারি গোছের লম্বা। প্রায় প্রবীরেরই সমান। মাথায় কান-ঢাকা বর্ষাতি টুপি, গায়ে বেশ দামী লম্বা ওয়াটার-প্রুফ, পায়ে গাম-বুটস্।

দরজা বন্ধ হবার পর মাথার টুপিটা খুলতেই একরাশ এলোথেলো ঈষৎ কটা চুল—যেন ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। সেই টুপিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে এক হাতে দুলিয়ে আগন্তুক বলেছে,—"এই অসময়ে আপনাদের জ্বালাতন করবার জন্যে মাপ চাইছি। অধীনের নাম মধুসূদন দত্ত।"

শুধু বলার ধরনে নয়, নামটা শুনেও কণিকার হাসি পেয়েছে। শুধু ভঙ্গিতেই নয়, চেহারায় ও গলাতেও মধুসূদনের ছেলেমানুষীটা এখন ধরা পড়ে যায়। মুখটা টুপিতে ঢাকা থাকার দরুনই গোড়ায় বোধহয় কেমন একটু অদ্ভুত লেগেছিল।

কেউ কিছু বলার আগেই মধুসূদন একগাল হেসে বলছে,—"নামটা শুনে মেঘনাদবধ কাব্য যদি আপনাদের মনে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি নাচার। বাপ-মার নামকরণের ভুলে সব জায়গায় এই লজ্জাই আমায় পেতে হয়। তাঁরা অনেক আশা করে হয়ত ও-নাম রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পুত্ররত্নটি যে একটা ছড়া কাটতেও শিখবে না তা তাঁরা কি করে জানবেন। হ্যাঁ, আসল কথাই ভুলে গেছি জিজ্ঞাসা করতে। আমি ঠিক জায়গায় এসেছি ত? এইটিই ত কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস—স্বাস্থ্যোদ্ধার বাংলাদেশেই করুন—যার ধুয়া! ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারে সাইনবোর্ড-টোর্ড কিছু দেখতে পাইনি কিনা।"

"না দেখতে পেলেও ভুল জায়গায় আসা বোধহয় সম্ভব ছিল না"—কণিকা হেসে বলেছে,—"কারণ এ তল্লাটে দশ মাইলের মধ্যে আর কোঠাবাড়িই নেই।"

"তার মানে চোখ বুঁজেও চলে আসতে পারতাম বলছেন? তা একরকম তাই এসে'ছি।"—বলে মধুসূদন হেসেছে।

প্রবীর এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার যেন একটু অপ্রসন্ন ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে,—"কিন্তু আপনি এলেন কি করে?"

"এক রকম উড়েই এসেছি ভেবে নিতে পারেন।—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই মধুসূদন সজোরে হেসেছে।

রসিকতাটা ঠিক উপভোগ না করে প্রবীর আবার গম্ভীর ভাবে বলেছে,—"আপনার গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাইনি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"না, আপনাদের রহস্যের মধ্যে রাখা উচিত নয়। গাড়িতেই আমি এসেছি। তবে মাইলখানেক দূরে গাড়িটা হঠাৎ বেঁকে বসল কি-না তাই স্যুটকেসটা নিয়ে হেঁটে আসা ছাড়া আর উপায় রইল না।"

"আপনার আর সব জিনিস কি গাড়িতেই পড়ে রইল ?"

আর সব জিনিস!"—প্রবীরের প্রশ্নে যেন একটু অবাক হয়েই মধুসূদন বলেছে,—"আর সব জিনিস আমার কোথা থেকে আসবে। আমার যা কিছু সব এই স্যুটকেসে।"

অবাক হয়ে প্রবীর কিছু বলবার আগেই কণিকা বলেছে,—"কিন্তু এই দরজায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এমন আলাপ করবেন! আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।"

"ধন্যবাদ!"—বলে স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে মধুসূদন কণিকার পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে,—"এখুনি যেন ঘুমোতে যাবেন না। স্যুটকেসটা রেখেই আপনাদের আবার বিরক্তি করতে আসছি।"

প্রবীর কিছু উত্তর দেয়নি, কিন্তু হঠাৎ লোকটার প্রতি কেন বলা যায় না কেমন একটা বিদ্বেষই যেন অনুভব করেছে।

মধুসূদন তারপর সে রাত্রে কিন্তু বিরক্ত করতে আর আসেনি। কণিকা খানিক বাদে নেমে আসবার পর প্রবীর তার অপ্রসন্নতাটুকু না লুকিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে,—"কি, তোমার সিনেমা-হিরোটি কি রকম মনে হচ্ছে ?"

"আমার সিনেমা-হিরো!"—কণিকা ভুরু কুঁচকে প্রবীরের দিকে

তাকিয়েছে, তারপর হেসে ফেলে বলেছে,—"ও! মধুসূদনের কথা বলছ! বলো—মহাকবি, সিনেমা হিরো বলছ কেন?"

"সিনেমা হিরোর charming personality দেখে বলছি! তা বিরক্ত করতে বেরুলেন না যে বড়?"

"না, আমিই বারণ করলাম। বললাম, এই ঝড়বৃষ্টিতে এতখানি হেঁটে এসেছেন। আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। আপনার খাবার ওপরে দিয়ে যাচ্ছি।"

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশ-ট্রেতে ঘষে নেভাতে নেভাতে একটু যেন তিক্ত স্বরে প্রবীর বলেছে, "তুমি আবার ওপরে যাবে খাবার দিতে। এটা অতিথি-সৎকারের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু উপায় কি বলো! চাকর বাকরদের ত ছুটি দিয়ে দিয়েছি তারা খাওয়া দাওয়া সেরে চলে গেছে। এখন এই বৃষ্টিতে বাগান দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে ডাকতে যাওয়ার চেয়ে নিজে দিয়ে আসাই সুবিধের নয় কি!"

"কিন্তু তিনি নিজে নেমে এসে খেয়ে গেলেই বা দোষ কি ছিল!"—প্রবীর কণিকার যুক্তি মানতে না পেরে বলেছে।

"দোষ ছিল এই যে, এখন এসে বকবক করে আমাদের কতক্ষণ জাগিয়ে রাখত কে জানে। কী বকবক করতে পারে দেখেছ ত!"

"হুঃ"—বলে প্রবীর এবার চুপ করেছে।

কণিকা নিজে থেকেই বলেছে,—"ছেলেটা কিন্তু ভারী আমুদে ভাল মানুষ, বাপু। নিজে থেকেই বললে, এত রাত্রে আমার খাওয়ার জন্যে যেন ব্যস্ত হবেন না, কালিয়াপোলাও যা হোক দুটো দিয়ে যান, তাতেই আমার চলবে।'—বললাম—'অত সস্তা জিনিস আমরা রাখিনা, তার বদলে খানিকটা রুটি মাখন আর জ্যাম দিয়ে যাচ্ছি, হবে ত?' বললে—'খুব হবে!'

হঠাৎ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে কণিকা থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—'কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে এরই মধ্যে !...

পরের দিন মধুসূদনের আরো নতুন পরিচয় পাওয়া গেছে। সকাল বেলাই একটা পা-জামা পাঞ্জাবি পরে নিচে নেমে একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির—"কি রাঁধছেন কণিকা দেবী, আমি একটু সাহায্য করতে পারি ?"

প্রবীর স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরুবার আগে তখন কণিকার কাছে কুল্‌টি থেকে আরো কিছু আনবার আছে কি-না জানতে এসেছে।

বিরক্তিটা গোপন না করেই সে বলেছে,—"সাহায্য করবার যদি অত আগ্রহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন না। কুল্‌টি পর্যন্ত যাচ্ছি সারা রাস্তা অনেক কিছু সাহায্য করতে পারবেন।"

মধুসূদন প্রবীরের শ্লেষ যেন টেরই পায়নি। হাসিমুখে বলেছে,—"ওরে বাবা, এই বৃষ্টিতে সেই কুল্‌টি! গাড়ি হয়ত মাঝপথেই কোথাও বিগড়ে আটকে থাকবে! আমি ওসব বীরত্বের মধ্যে নেই! আর আমি শুধু রান্নার সাহায্য করতেই ভালোবাসি।"

"বুঝেছি!"—প্রবীর বেশ একটু বিদ্রূপের সুরেই বলেছে,—"আপনার বীরত্ব শুধু হেঁসেলেই আপনি দেখাতে পারেন। আচ্ছা আমি চললাম কণা, তোমার হেঁসেলের কাজে ত মস্ত সহায় পেয়েছ। রান্নাবান্নাগুলো আজ ভালোই হবে আশা করি।"

প্রবীর বেরিয়ে যেতে মধুসূদন হেসে বলেছে,—"আপনার স্বামীর আজ বেরুবার ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়।"

কথাটা কণিকার কেমন যেন অবান্তর মনে হয়েছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রবীর ফেরেনি।

কণিকাকে আর সকলের সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে। টেবিলে তারা চার জন। মিস্ ধর আজ অনুগ্রহ করে সকলের সঙ্গে খেতে রাজী হয়েছেন।

খাওয়ার টেবিল একাই মাৎ করে রেখেছে মধুসূদন। সে সময়ে এমনিতে তার আমুদে স্বভাব ভালোই লেগেছে কণিকার, কিন্তু এক-এক বার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়েছে।

খাবার টেবিলে সেই ভূতের ভয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মধুসূদন যে ধরণের রসিকতা করেছে কণিকার তা ভাল লাগেনি।

কথাটা মিস, ধরই তুলেছেন,—"এ রকম ভূতুড়ে বাড়িতে হোটেল খোলার কোনো মানে হয় না।"

"ভূতুড়ে বাড়ি!"—কণিকা অবাক হয়ে বলেছে।

চির-নীরব ডাঃ বাজপেয়ীও প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

মধুসূদন গম্ভীর হবার ভান করে জিজ্ঞাসা করেছে,—"ভূত-টুত কিছু দেখেছেন নাকি সত্যি। আমি জানতাম এ বাড়িতে ভূত না থেকেই, পারে না। আপনার ভাগ্যি ভালো আগেই দেখে ফেললেন। যাক তাহলে ত এ বাড়ির তুলনা নেই।"

মধুসূদনের দিকে ভ্রূকুটি করে মিস্ ধর বলেছেন,—"না, ভূত-টুত এখনো দেখিনি। কিন্তু সারারাত অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনেছি। একবার ত মনে হ'লো কে যেন আমার দরজাটা খোলবার চেষ্টা করছে।"

কণিকা একটু হেসে বলেছে,—"ঝড়বৃষ্টিতে ওরকম আওয়াজ ত স্বাভাবিক। আর এ-বাড়ির যা সব মজবুত দরজা, ভূতের হাতে কুড়ুল না থাকলে খোলা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু কুড়ুল দিয়েই যদি কেউ খোলে।"—মিস্ ধর তর্কে হারতে রাজী হননি,—"যা জন-মনিষ্যিহীন জায়গা, এখানে এক দল ডাকাত এসে আমাদের খুন করে রেখে গেলেই বা রুখবে কে।"

'আমি ত অন্ততঃ নয়!"

মধুসূদনের কথার ধরনে আর মুখ চোখের মজার ভঙ্গিতে কণিকা হেসে ফেলেছে।

মিস্ ধর আরো বিরক্ত হয়ে বলেছেন,—"এ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এখানে ডাকাত পড়া কি এমন অসম্ভব? এই ত কলকাতা শহরেই কদিন আগে সন্ধ্যেবেলা কিভাবে একজনকে খুন করেছে, পড়েছ?"

কণিকা আগের দিন কাগজে খবরটা পড়েছিল। বললে, "সে ত কোন পাগলের কাজ। নইলে ওই নিরীহ প্রৌঢ়াকে অমন গলায় ফাঁস দিয়ে কেউ অকারণে মারতে পারে?"

"অকারণে কেন বলছেন!"—মধুসূদন বলেছে,—"হয়ত বুড়ীর ঘরে মোহরের ঘড়া লুকোনো ছিল।"

"না, পুলিশ সে রকম কোনো প্রমাণ পায়নি।"—ডঃ বাজপেয়া তাঁর নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করায় সবাই অবাক হয়েছে।

"পুলিশ কি পেয়েছে তা কি সবাইকে জানায়!"—মধুসূদন হালকা সুরে বলেছে,—"নির্ঘাৎ বুড়ীর লুকোনো পয়সাকড়ি ছিল, আর নয় বুড়া কোনো চোরাই ব্যবসার মালিক, নাম ভাঁড়িয়ে ওই গিরি মাঝি লেনে ছিল। শত্রুপক্ষের কেউ এসে দিয়েছে সাবাড় করে। যাক, বুড়া বেশ আরামেই গেছে!"

মিস্ ধর চটে উঠে বলেছেন—"গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে মারল, আর বলছ আরামে গেছে!"

"হ্যাঁ, ফাঁস দিয়ে মরার মজা জানেন না বুঝি! ভারী আরাম!"—বলে মধুসূদন যেভাবে হাসতে হাসতে গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ডাক্তারীর বিবরণ যা দিয়েছে, কণিকার কাছে তা অত্যন্ত বিসদৃশই লেগেছে।

মিস্ ধর বিরক্তি হয়ে টেবিল ছেড়েই উঠে গেছেন।

ডাঃ বাজপেয়া পর্যন্ত সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে তাকিয়েছেন।

ঝড়জলের ভেতর নানা জায়গায় মোটর প্রায় নৌকার মত চালিয়ে ড্রাইভার কণিকাকে যখন স্বাস্থ্যনিবাসে পৌঁছে দিল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

তখনও প্রবীর ফেরেনি দেখে কণিকা বেশ একটু চিন্তিতই হ'ল।

কোনো কারণে আটকে গেলে প্রবীরের ত ফোন করাও উচিত ছিল। কেন যে সে তা করেনি কে জানে।

উদ্বিগ্ন হয়ে কণিকা কুল্‌টির একটি বড় দোকান নিজেই ফোন করে খোঁজ নিলে।

কিন্তু সেখানেও কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রবীর সেখানে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেলা এগারোটাতেই দোকানে থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

বোর্ডারদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। মিস্ ধর ও ডাঃ বাজপেয়ী নিজের নিজের ঘরে চলে গেছেন। মধুসূদনও আশ্চর্যভাবে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে।

মধুসূদনের পক্ষে সেটা একটু অস্বাভাবিক-ই বটে।

কণিকা রাত্রের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা রামসেবককে বলে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পুরোনো খবরের কাগজটা নিয়েই গিয়ে বসল।

পড়ায় কিন্তু মন বসতে চায় না।

ঝড়বৃষ্টি যেন ক্রমশঃই আরো তুমুল হয়ে উঠেছে।

শেষপর্যন্ত সত্যিই বন্যা হবে নাকি!

রামসেবক এ অঞ্চলেরই লোক, তার কাছে বছর-পঁচিশ আগের ভয়ঙ্কর এক বন্যার গল্প সে শুনেছে। বরাকরের জল কূল ছাপিয়ে এসে সমস্ত এলাকাটাই নাকি ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই সমুদ্রের মধ্যে এই বাড়িটিই নাকি ছিল একা দাঁড়িয়ে।

তাই যদি হয় আবার।

অন্য কোনো ভয় না থাক, এতগুলো মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। কতদিনে জল নেমে পথঘাট খুলবে কে জানে!

তার ভাঁড়ার অবশ্য সে ভর্তি করেই রাখবার ব্যবস্থা করেছে। আর কিছু না-হোক, চালে ডালে খিচুড়ি করে দিতে পারবে।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসের ত তাহলে ভবিষ্যৎ ঝাঁঝরা। শুরুতেই যে বদনাম তাহলে রটবে, সে কি আর কখনো কাটানো যাবে?

হঠাৎ চমকে কণিকা কান খাড়া করে রাখল।

যেন একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না!

ঝড়বৃষ্টির শব্দ যা বেড়েছে তাঁতে অবশ্য বোঝা শক্ত। কিন্তু ষ্টেশন-ওয়াগন এলে ত তার আলো দেখা যেতো দূর থেকেই।

কণিকা আবার তার হাতের কাগজটায় মন দেবার চেষ্টা করল: খবরগুলো সবই প্রায় পড়া হয়ে গেছে।

কলকাতার সেই খুনের খবরটাই আর একবার পড়ে দেখলে। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! অকারণে এ-রকম খুন কি কেউ করে!

লোকটার যা বর্ণনা দিয়েছে, তাতে ত অল্পবয়সী ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। মাথায় বর্ষাতি টুপি, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, বর্ষার দিন যে কোনো ভদ্রলোকেরই ত এই পোশাক। সেই পোশাকের তলায় উম্মাদ এক খুনী চলাফেরা করেছে কে ভাবতে পারে!

নাঃ, কি রকম অস্বস্তি লাগছে। মধুসূদন এ-সময়টায় থাকলেও দুটো গল্প করে সময় কাটানো যেত। মানুষটা বকবক করে বেশী, রসিকতাগুলোও বেয়াড়া, তবু হাসিখুশি বলে সঙ্গী হিসেবে ভালই লাগে।

"কে!"—আপনা থেকেই কণিকার গলা দিয়ে চীৎকারটা বেরিয়ে গেল।

বৃষ্টির ঝাপটাটা অন্য দিকে বলে জানলার শার্সি দিয়ে গাড়ি বারান্দার দিকের রাস্তাটা খানিকটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আগাগোড়া ঢাকা

একটা মূর্তি যেন সেখান দিয়ে চলে গেল।

পরমুহূর্তে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠতে কণিকার হাসি পেল নিজের আকস্মিক ভয়ে। খবরের কাগজের কাহিনীটা পড়েই মনটা অমন হয়েছিল।

এ ত স্পষ্ট প্রবীরের কড়া-নাড়া। তার কড়া-নাড়ার ধরনই আলাদা।

কিন্তু প্রবীর এল কিসে! তার গাড়ির শব্দ বা আলো কিছুই ত দেখতে পায়নি!

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে খুলতে সে সেই কথাই ভাবছিল।

দরজা খুলতে প্রবীর ভেতরে না ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে বললে,—শীগ্‌গির কণা, ছাতাটা নিয়ে এসো শীগ্‌গীর!

"ছাতা!"—কণিকা বেশ অবাক্। প্রবীরের ত মাথায় বর্ষাতি টুপি, গায়ে ম্যাকিণ্টস্! মাথায় ছাতা কি হবে।

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ছাতাটা নিয়ে এসো। অতিথিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে হবে ত!"

কণিকা একটু বিমূঢ় ভাবেই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে ছাতাটা নিয়ে এসে প্রবীরের হাতে দিলে। প্রশ্নটা কিন্তু সেই সঙ্গে না করে পারলে না,—"অতিথি নিয়ে তুমি এলে কিসে?"

"এলাম গাড়িতে, আবার কিসে? ঠিক বাড়ির কাছে এসেই মোটরটা একেবারে গেল বিগড়ে। আর তার এমন অপরাধই বা কি! একরকম অন্ধের মত ভাসতে ভাসতেই ত এসেছি। হেডলাইট পর্যন্ত গিয়েছে নিভে!"

প্রবীর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতিথিদের আনবার কথা বলেছে যখন, তখন একজনের বেশী নিশ্চয় এসেছেন। এই দুর্যোগেও তাহলে তাঁরা এলেন।

হেড লাইট নিভে গেছে বলেই কণিকা গাড়ির আসা টের পায়নি।

কিন্তু এত দেরীতে ভাসতে ভাসতে আসার মানে কি ?

বন্যা কি সত্যিই তাহলে শুরু হয়েছে ?

অতিথিরা এসে যে-যার ঘরে যাবার পর জানা গেল কণিকার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে সত্য।

প্রবীরের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বন্যার জল ইতিমধ্যেই চারিদিক ডুবিয়ে দিতে শুরু করেছে। আবহাওয়ার যা গতিক, তাতে সে জল আরো বাড়বে বলেই মনে হয়।

"সেই জন্যেই কি তোমার এত দেরী হল ?"—জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

"শুধু সেই জন্যে নয়। প্রথমতঃ, ট্রেন প্রায় তিনঘণ্টা লেট বলে স্টেশনেই বাধ্য হয়ে থাকতে হ'ল বিকেল অবধি। বেণীবাবু এই ট্রেনে আসবেন লিখেছিলেন। তাঁকে ছেড়ে ত আসা যায় না! তারপর রাস্তায় আবার মিঃ বীরস্বামীকে উদ্ধার করতে বেশ খানিকটা সময় গেল।"

"উদ্ধার করতে কি রকম ? নামটাও বলছ বীরস্বামী। উনি বাঙালী নন ?"

"না, দেশ দক্ষিণ ভারতে কোথাও ছিল, তবে শুনলাম বাংলাদেশেই বহুকাল ধরে আছেন বলে বাংলাটা মাতৃভাষার মতই হয়ে গেছে।"

"কিন্তু ওঁকে উদ্ধার করতে হ'লো কেন ?"—কণিকার কাছে ব্যাপারটা যেন কেমন আজগুবি মনে হচ্ছিল।

"উদ্ধার করতে হ'ল—ওঁর গাড়ি বানের জলে অচল হয়ে যাওয়ার দরুন উনি একেবারে তেপান্তরের মাঝখানে সত্যিই কূল পাচ্ছিলেন না বলে। অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মাঝে দূরে একটা আলো জ্বলতে-নিভতে দেখেই আমাদের প্রথম কেমন অদ্ভুত লাগে। তারপর মোটরের হর্ন শুনে সেদিকে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের ওই অবস্থা। ওকে তুলতে গিয়ে

আমাদের গাড়িই ত খানায় পড়ে উল্টে গেছল আর কি।"

"কিন্তু ভদ্রলোক ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?"—কণিকা প্রশ্ন না করে পারল না।

"অত কথা জিজ্ঞাসা করিনি।"—প্রবীর একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললে,—"কেউ বিপদে পড়লে কি অত জেরা ক'রে তবে তাকে সাহায্য করতে হয়!"

"না, তা হয় না। তবে কোথায় দেশ, বাংলা ভাষায় কি ক'রে এত দখল, এত কথা যখন জেনেছ, তখন ওই কথাটাও জিজ্ঞাসা করতে পারা যেত না?"

"তোমার কি কিছু সন্দেহ আছে নাকি? —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রবীর।

"জানি না, কিন্তু আমার কেমন ভালোও লাগছে না। একে এই দুর্যোগ ঠিক হোটেল খোলার পরই, তার ওপর আমাদের বোর্ডাররাও কেমন যেন সব অদ্ভুত জুটেছে আমার মনে হচ্ছে।

প্রবীর হেসে ফেলে বললে,—"বোর্ডার ত আর নিজেরা বাছাই করে নেওয়া যায় না। তা যদি যেত তোমার ওই সিনেমা-হীরো, থুড়ি, মহাকবিকে আগেই বিদেয় করতাম।"

এবার কণিকা হেসে ফেলেছে,—"তোমাদের সত্যি কুক্ষণে দেখা হয়েছে। নইলে মধুসূদন ছেলেটা সত্যি খারাপ নয়। একটু মাত্রাজ্ঞান কম, এই যা।"

প্রবীর কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

"এখন আবার ফোন করে কে!"—ব'লে কণিকাই গিয়ে ফোনটা ধরলে।

"হ্যালো!"—একটু অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল,—কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস?

কণিকা হ্যাঁ, বলবার আগেই ওধার থেকে আবার প্রশ্ন হল,—"ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"—উচ্চারণে একটু রাঢ়

দেশের টান।

"যা বলতে চান আমাকেই বললে পারেন।"—কণিকা জানালে।

"কে আপনি?"—আবার প্রশ্ন হ'ল।

"আমি—মানে—স্বাস্থ্যনিবাস আমরাই খুলেছি। আমি মিসেস লাহিড়ী।'

"ওঃ, আপনি মিসেস লাহিড়ী! আচ্ছা শুনুন,—আওয়াজটা এবার বেশী গম্ভীর হয়ে এল,—"আমি বরাকর থানা থেকে ইসমাইল সাহেব বলছি।"

নিজের অজান্তেই কণিকা বুঝি একটু চমকে উঠল,—"ও, থানা থেকে বলছেন? কি ব্যাপার বলুন ত!"

"দেখুন একটা বিশেষ দরকারে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালকে আপনাদের ওখানে পাঠিয়েছি। ফোনে বেশীকিছু আর বলতে চাই না। যা বলবার তিনিই গিয়ে বলবেন। তাঁর পৌঁছোতে বিশেষ দেরী হবে না।

'"কিন্তু—কিন্তু এখানে আসবার ত কোনো উপায় নেই। রাস্তাঘাট সব বন্যার জলে ডুবে গেছে যে। বন্যা ক্রমশঃই বাড়ছে।"—কণিকার আশঙ্কাটা যেন আশার মতই শোনাল।

ওধার থেকে একটু যেন কড়া গলাতেই শোনা গেল,—"প্রলয় হলেও তিনি ঠিকই পৌঁছোবেন। আপনাদের ভাবনা নেই। আর শুনুন, আপনার স্বামী মিঃ লাহিড়ীকে তাঁর সব কথা ভালো করে শুনে তাঁর নির্দেশ মত সবকিছু করতে বললেন। কোন ত্রুটি যেন না হয়।"

"কিন্তু ইসমাইল সাহেব...!" কণিকা আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওধারে লাইন কেটে দেবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কণিকার দিকের একতরফা কথা শুনেই চিন্তিত মুখে প্রবীর তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন ভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি, ব্যাপার কি? কি বলছে বরাকর থানা থেকে?

কণিকা তখনও নিজেকে ভালো করে সামলাতে পারেনি। ধরা-গলায় বললে,—"কে একজন সি-আই-ডি অফিসার না ইন্‌স্পেক্টরকে এখানে পাঠাচ্ছে।

"সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর!"—প্রবীরের চোখ বড় হয়ে উঠল,—"কেন?

"জানি না। ইন্‌স্পেক্টরই এসে আমাদের জানাবে বললে।"—কণিকা অসহায় ভাবে প্রবীরের দিকে তাকাল।

"কিন্তু পুলিশ আসবার একটা কারণ ত চাই। —প্রবীর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলে,—"এখানে কিছু ত হয় নি!"

"কি করে তা জানছ!"—কণিকা কাতর ভাবে বললে, "আমরা—আমরা কোনো অন্যায় কি করেছি?—কোনো আইন ভেঙেছি কি ভুলে? সেদিন ওপার থেকে গরুগাড়ীতে চাল আসছিল। একটু সস্তা বলে তাই কয়েক বস্তা কিনেছিলাম। কিন্তু তা ত বে-আইনী নয় আজকাল।"

"কি বাজে বকছ!"—প্রবীর একটু বিরক্ত হয়েই বললে,—"বে-আইনীও যদি হয়, যদি চোরাই মালও কিনে থাকো, তার জন্য এই বন্যার মধ্যে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেকটর আসে নাকি?"

"তাহলে? তাহলে?"—কণিকা উদ্বেগের সঙ্গে বললে,—"আমাদের এখানে এমন কোনো লোক কি এসেছে পুলিশ যাকে খুঁজছে। কিন্তু আমরা তা কি করে বুঝব?"

"নিশ্চয়ই—আমাদের কি দোষ! তুমি মিছিমিছি ভেবোনা!"—বলে প্রবীর কণিকাকে কাছে টেনে একটু আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু কণিকার মন এত সহজে শান্ত হবার নয়। স্বামীর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সে অনুশোচনার সঙ্গে বললে,—"এখন মনে হচ্ছে এ স্বাস্থ্য-নিবাস না খুললেই হ'ত। গোড়াতেই এই দুর্যোগ, তার ওপর কি হাঙ্গামা এখন হবে কে জানে!"

হাঙ্গামা যে তাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে দেবে কে জানত। পরের দিন সকালেই জানা গেল বন্যার জল দ্বীপের মত তাদের বাড়িটাকে ঘিরে প্রায় নিচের তলার ঘরগুলোতে ঢোকবার উপক্রম করছে। ভিত্ নেহাত উঁচু বলেই এখনো তারা রক্ষা পেয়েছে। এ জল কতদিনে নামবে কে জানে।

ভোরে উঠে বোর্ডারদের ঘরে চা পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেদের ঘরেই বসে প্রবীর ও কণিকা এই সমস্যারই আলোচনা করছিল'—এমন সময় ঘরের আধ-ভেজানো দরজাটায় এবার টোকা শোনা গেল।

কণিকা 'আসুন' বলার আগেই মিস্ ধর বেশ একটু অপ্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকেই গলা ছাড়লেন।

'এই যে তোমরা এখানে। বলি পয়সা-কড়ি ত কিছু কম নেবে না, কিন্তু সাধারণ সুবিধাগুলোও না দিয়ে কি ডাহা ফাঁকি দেবে এমন করে?'

কি হয়েছে?—প্রবীর একটু রূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

কি হয়েছে? ওপরের বাথরুমে এক ফোঁটা জল নেই। ওপরে ঘর নিয়ে জলের জন্যে কি নিচ-ওপর করব নাকি রাতদিন।

প্রবীরের ইচ্ছা হ'ল বলে,—জলের অভাব কি? বাইরে বানের জলে ত ডুবে মরতেও পারেন।' কিন্তু নিজেকে সামলে সে গম্ভীর ভাবে বলল,—'আচ্ছা আমি দেখছি।'

প্রবীর বেরিয়ে যাবার পর মিস্ ধর কণিকাকে নিয়ে পড়লেন,—'দেখো বাপু কিছু মনে না করো ত বলি। ওই ছোকরার রকম-সকম আমার ভালো লাগছে না।'

ছোকরা বলতে সে মধুসূদনের কথাই বলছেন, তা বুঝেও কণিকা জিজ্ঞাসা করলে ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করে—'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে তোমার ফাজিল অসভ্য ছোকরা – চুলগুলো যার কাকের বাসা হয়ে আছে। চুলগুলো অ'াছড়াতে পারে না ?'

চুল না অ'াচড়ানোটা কত বড় অপরাধ বুঝতে না পেরেই বোধহয় কণিকা চুপ করেই রইল।

মিস্ ধর বললেন, – 'ওর নামটাও আমার যেন ভ'াড়ানো মনে হয়। কোথায় মহাকবি মধুসূদন দত্ত, আর কোথায় এই বকাটে একটা বালগুলে।'

মনে মনে চটলেও বাইরে হালকাভাবে কণিকা মিস্ ধরকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে,—'কানা ছেলের মাম পদ্মলোচন হয় ত ?'

'হয়, কিন্তু এ ছোকরাকে দেখলে মনে হয় ওর ভেতর গণ্ডগোল আছে। কিছু জানো তুমি ওর সম্বন্ধে ?'

এবার আর কণিকা বিরক্তিটা চাপতে পারলো না, একটু কঠিন স্বরেই বললে—এই আপনার সম্বন্ধেও যতটুকু আমি জানি ততটুকুই। আপনি একমাসের জন্যে, আর মধুসূদন সাত দিনের জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে এসেছেন। আপনারা যা নাম দিয়েছেন তা-ই আমাদের খাতায় লেখা হয়েছে। তার জন্যে পুলিশে খবর দিতে যাইনি। আপনারা এখানে কে কি, তা ত আমার জানবার দরকার নেই। আমার ন্যায্য পাওনা শুধু চুকিয়ে দিয়ে এখানে অন্য গোলমাল না করে যে খুশী আপনারা থাকুন না! আপনাদের ঠিকুজী-কুষ্ঠিতে আমার কি দরকার ?'

মিস্ ধর একটু যেন জব্দ হলেন, কিন্তু গলায় ঝাঁঝ তাতে ক'মল না। – 'তোমাদের বয়স কম, দুনিয়ার কিছুই জানো না, তাই ভালো দুটো পরামর্শই দিতে এসেছিলাম। পছন্দ না হয় নিওনা। এই যে, কোত্থেকে উট্‌কো একজন লোক না-বলে-কয়ে কাল রাত্রে এসে উঠেছে এখানে। বাঙ্গালীও নয়। কি মতলবে কে অমন এসেছে তাই বা কে জানে ?'

এই ধরনের প্রশ্ন নিজেই কাল রাত্রে করেছে মনে করে কণিকার গলায় বিরক্তিটা এবার আর প্রকাশ পেল না।

স্বাভাবিক গলাতে প্রবীরের কথাগুলোই সে বললে,—'কিন্তু আমাদের উপায় কি বলুন। বন্যার জলে মোটর খারাপ হয়ে ভদ্রলোক বিপদে পড়েছিলেন। তাঁকে কি আশ্রয় না দিয়ে ফেলে আসা যায়?'

'কিন্তু যাই বলো, ওই বীরস্বামী না কী নাম নিয়ে এসেছে, আমার ত মনে হয়...

'ব'লে ফেলুন যা মনে হয়, ব'লে ফেলুন।'--আসামীর নাম করতেই সে হাজির।

মিস্ ধর ও কণিকা দুজনেই চমকে সে-দিকে তাকাল। মিঃ বীরস্বামী কখন নিঃশব্দে যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরও পায় নি তারা।

'ওঃ—একেবারে চমকে গেছলাম!—মিস্ ধর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বীরস্বামীর দিকে তাকালেন,—'কখন এসেছেন টেরও পায়নি!'

'হ্যাঁ, আমি একেবারে চুপি চুপি আসি!—এমনি করে পা টিপে টিপে!—বীরস্বামী একটু হেঁটে চুপি চুপি আসাটা দেখিয়েও দিলেন। —'কেউ কিছু টের পায় না ব'লে কত মজার কথা শুনতে পাই। আর যা শুনি, আমি কখনো ভুলি না।'

মিস্ ধর কেমন যেন একটু ভড়কে গেছেন মনে হ'ল।—যাই বাথরুমের কি হল আবার দেখি।'—বলে আর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না।

বীরস্বামী তার পেছনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, তারপর কণিকার দিকে ফিরে একটু সকৌতুক স্নেহের সুরেই বললেন,—'আমাদের গৃহিণী দেবী একটু যেন ভাবনায় পড়েছেন মনে হচ্ছে!'

চেহারা ভারিক্কি এবং মাথায় চুল পাকা হ'লে কি হয়, বীরস্বামীর ধরন-ধারন একটু ভাঁড়ের মত।

চলন-বলনও ঠিক বয়সের উপযোগী নয়, যেন বুড়ো খোকা ধরনের।

প্রবীরের যেমন মধুসূদনকে, কণিকার তেমনি লোকটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লাগেনি।

তবু জবাব একটা না দিলে নয়, কণিকা তাই একটু হেসে বললে,—"ভাবনার আর অপরাধ কি বলুন! এই বন্যায় কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।"—ব'লে বীরস্বামী আবার হো-হো ক'রে হাসলেন।

বিমূঢ় ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে কণিকা বললে,—"বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।"

"পারলেন না বুঝি।"—বীরস্বামীর চোখে যেন দুষ্টুমির হাসি,—"এখন না পারুন, পরে হয়ত পারবেন। তবে অনেক কিছুই আপনি বোঝেন না তা দেখতেই পাচ্ছি।"

"যেমন?"—কণিকা এবার একটু উষ্ণ।

"যেমন অতি সরল হওয়া ভালো নয়।"

"আমি যে অতি সরল তা এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছেন?"—কণিকা বিদ্রুপের স্বরে বলবার চেষ্টা করলে।

"তা আর বুঝিনি? এই ভারতবর্ষের সাতঘাটের জল এই বয়স পর্যন্ত কি খেয়ে বেড়াচ্ছি মিছিমিছি?"

"আপনি সারা ভারতবর্ষই ঘুরে বেড়ান বুঝি?"

"দরকার হলেই বেড়াই, আবার ঘাপ্‌টি মেরেও থাকি কখনো কখনো।"—বলে বীরস্বামী আবার হাসলেন।

বীরস্বামীর যাবার কোনো নাম নেই। তাই নেহাৎ আলাপ চালাবার জন্যেই কণিকা বললে,—"বাংলাটা বেশ ভালো বলতে ত পারেন দেখছি?"

"আপনি তারিফ করছেন তাহলে। কিন্তু আমার মাতৃভাষা নয়।"

"তা ত নাম শুনেই বুঝছি।" — মুখে বললেও কণিকার কেমন হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, হয়ত বীরস্বামী নামটাই মিথ্যে।

তার সন্দেহটা যেন বুঝতে পেরেই বীরস্বামী বললেন, — "অবশ্য আমি বলছি বলেই যেন সব কথা বিশ্বাস করে বসবেন না। বিশ্বাস কাউকেই করবেন না, অতি আপন জনকেও না।"

"আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।" — কণিকার গলাটা কিন্তু অপ্রসন্নই শোনাল।

"কথাটা আপনার ভালো লাগলো না বুঝতে পারছি।" — বীরস্বামী তার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসলেন, — "কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়ে খাঁটি কথা নেই।"

একটা জানালার ছিট্‌কিনি বুঝি একটু আলগা ছিল। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় পাল্লা দুটো সশব্দে খুলে গিয়ে বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজে গেল।

কণিকা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই বীরস্বামী "থাক্, আমিই বন্ধ করছি" — ব'লে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

এবারেও কণিকা লক্ষ্য করলে যে বয়সের তুলনায় বীরস্বামীর চলা-ফেরা বেশ চটপটে যুবকের মত।

জানলাটা বন্ধ ক'রে বীরস্বামী পাশের টেবিলের একটা বই হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এমন সময় যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে কণিকা সত্যিই অবাক। দু'বেলা খাওয়ার সময়টিতে ছাড়া নিজের ঘর থেকে যিনি বার হন না, সেই ডাঃ বাজপেয়ী নিজে এ ঘরে নেমে আসবেন, কণিকা ভাবতেই পারেনি।

ডাঃ বাজপেয়ীর সদা-গম্ভীর মুখে সাধারণতঃ কোনো ভাব-টাব বিশেষ ফোটে বলে মনে হয় না।

এখনও তিনি ঘরে ঢুকে সেই কাঠের মূর্তির মত চেহারা নিয়েই উচ্ছ্বাসহীন ভারী গলায় বললেন, — "মাফ করবেন। মিঃ লাহিড়ীকে-

দেখতে পেলাম না। ওপরের ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমার ঘরে আলো জ্বলছে না।"

"দিনের বেলায় আলো নিয়ে কি করবেন।" – কণিকা হয়ত বলতে পারত।

কিন্তু দিনের পর রাত ত আসবে। কোনো মিস্ত্রী পাবার যেখানে আশা নেই – সেখানে ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হলে অবস্থা কি হবে কল্পনা করে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

"কি বিপদ দেখুন ত! এদিকে বন্যা, ওদিকে পুলিশ আসছে, তার উপর আবার এই ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হওয়া।" – তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

কারুর কাছে কোনো সহানুভূতি পাবার আশায় কণিকা কথাটা বলেনি, কিন্তু ওই ক'টা কথায় অমন ফল হবে সে জানত না।

বীরস্বামীর হাতের বইটা সশব্দে পড়ে গেল। ডাঃ বাজপেয়ীর ভাবলেশহীন মুখখানাতেও কেমন যেন একটা বিমূঢ়তার চেহারাই ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রায় ধরা-গলায় বললেন, – "কি বললেন? পুলিশ আসছে?"

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখোশের মত মুখের পেছনেও একটা কিছু আবেগের আলোড়ন যে চলছে তা কণিকার অগোচর রইল না।

সেটা সন্দেহ, না ভয়, না উত্তেজনা, তা ঠিক বোঝা শক্ত।

কণিকার হঠাৎ মনে হ'ল এই নিরীহ চেহারার গম্ভীর লোকটির ভেতরে গভীর কোনো রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাঃ বাজপেয়ী প্রায় স্বাভাবিক গলাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, – "পুলিশ আসছে বললেন না? কি ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, বরাকর থানা থেকে কাল রাত্রে ফোন করেছিল। কে একজন

সি-আই-ডি অফিসারকে ওঁরা এখানে পাঠিয়েছেন বললেন।" – জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কণিকা একটু আশার সুরেই বললে' – এখনও পর্যন্ত যখন আসেননি তখন এই বন্যায় আর আসতে পারবে বলে মনে হয় না।"

কিন্তু পুলিশ আসছে কেন?" – ডাঃ বাজপেয়ী কণিকাকেই যেন জেরা করলেন।

কণিকা কিছু বলবার আগেই, "ঝকমারী হয়েছে হোটেল খোলা" – ব'লে প্রবীর ঘরে ঢুকল। তারপর বোর্ডার দুজনকে ঘরে দেখে ও তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, – কি হয়েছে কি?

ডাঃ বাজপেয়ী-ই তার দিকে এগিয়ে গেলেন – শুনলাম সি-আই-ডি পুলিশ এখানে আসছে। কেন বলুন ত?

কে জানে কেন। – প্রবীর বিরক্তির সঙ্গে বললে – কিন্তু আসছে বললেই ত হয় না। ওপর থেকে যা দেখলাম চারিধার একেবারে সমুদ্র হয়ে গেছে। দিগ্বিদিক চেনবার উপায় নেই। পুলিশ কেন মিলিটারী হলেও আজ আর আসবার উপায় নেই।

হঠাৎ জানলায় সজোরে শক্ত কিছুর দুবার ঘা দেওয়ার শব্দ শুনে চারজনেই চম্‌কে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শার্সিটা বৃষ্টির ছাটে প্রায় ঝাপসা। কিন্তু তারই ভেতর অস্পষ্ট একটা মূর্তি যেন শূন্যে কে এঁকে দিয়েছে। হাতে তার কটা যেন মুগুর আছে বলেই মনে হল।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থেকে ডাঃ বাজপেয়ী-ই প্রথমে জানালার দিকে ছুটে গেলেন। ক্ষিপ্র হাতে জানালা খুলতেই শূন্যে আঁকা মূর্তির রহস্য খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ওধারে একটি লোক ফাপানো রবারের ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে জানালার একটা গরাদ ধরে আছে। তার

অন্য হাতে ছোট একটা বৈঠা। বন্যার জল প্রায় জানালার তলা পর্যন্ত পৌঁছোবার দরুনই নৌকার ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে ঠিক শূন্যে ভাসছে বলে মনে হচ্ছিল।

ডাঃ বাজপেয়ী জানালা খুলতে সে একটু মাথা নুইয়ে হেসে বললে,—"ধন্যবাদ! আপনাদের দরজাটা একটু যদি খুলে দেন। আমি ইন্‌স্পেকটর ঘোষাল।"

"ইন্‌স্পেকটর ঘোষাল!" ডাঃ বাজপেয়ী সবিস্ময়ে আপনা থেকেই বলে উঠলেন।

অন্য সবাইও তখন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবীর নিজেই এবার গিয়ে বললে,—"বাইরের দরজা তো ওদিকে। অতদূর ঘুরে আপনাকে যেতে হবে না। এর পরেরটা ফ্রেঞ্চ-উইন্‌ডো। আমি খুলে দিচ্ছি, দাঁড়ান।"

ফ্রেঞ্চ-উইন্‌ডো-টা খোলবার পর ঘোষাল নৌকো নিয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকলেন।

রবারের ভেলার ভ্যাল্‌ভটা তারপর খুলে দিয়ে বললেন,—"দরজাটা এখন বন্ধ করে দিতে পারেন। আর আমার এই কাণ্ডারীটিকে রাখবার একটা জায়গা যদি দেখিয়ে দেন।"

ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডোর পাল্লা দুটো বন্ধ করে প্রবীর বললে,—"আসুন আমার সঙ্গে!"

হাওয়া বেরিয়ে ভেলাটা তখন চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। একহাতে সেটা তুলে নিয়ে ঘোষাল প্রবীরের পেছনে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু যাবার আগে একটু বাধা পড়ল। মিস্ ধর ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন,—আপনি ইন্‌স্পেকটর ঘোষাল? রবারের নৌকো বেয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে আসতে হয়, এমন কি ব্যাপার এখানে হয়েছে?"

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"একটু সবুর করলেই সব জানতে পারবেন,।

"আচ্ছা, কি জানান দেখি। পুলিশের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। ছেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়। আর পাঠিয়েছে কিনা আপনার মত এক ছোকরাকে! এই বয়সে ইনস্পেকটর। কোনো খুঁটির জোরে বোধহয় প্রমোশন পেয়েছেন!"

"তা হয়ত পেয়েছি!"—ঘোষাল আবার হাসলেন,—"কিন্তু আমার বয়স যত কম ভাবছেন তত নয়।"

ঘোষাল প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার পর বীরস্বামী-ই প্রথম কণিকার কাছে এসে তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'পুলিশ কেন ডাকিয়েছেন মিসেস লাহিড়ী?"

এ যেন আরেক বীরস্বামী। চোখ দেখলে ভয় করে।

কণিকা তাড়াতাড়ি—বললে, "আমরা ডাকিনি—বিশ্বাস করুন। ওই ত শুনলেন কি জন্যে এসেছে—খানিক বাদে জানবেন।'

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত মধুসূদন এসে ঢুকল, যেন দারুণ মজার ব্যাপার, এই ভাবে সোল্লাসে সে বলে উঠল,—"আরে, নরক ত একেবারে গুলজার! শুনলাম, শুনলাম কেন দেখলাম, পুলিশ এসেছে রবারের ভেলায় ভেসে। দারুণ একটা-কিছু তাহলে ঘটছেই। একেবারে রোমাঞ্চকর উপন্যাস!"

তার স্ফুর্তিতে কিন্তু আর কারুর সায় দেখা গেল না।

ডাঃ বাজপেয়ী তার দিকে একবার ভ্রূকুটি করে বললেন,—"আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি, মিসেস লাহিড়ী?"

"নিশ্চয়ই পারেন।

ডাঃ বাজপেয়ী ফোন করতে যাবার পর মধুসূদন আর একবার ফুর্তির সুরটা ধরবার চেষ্টা করলেন,—"ইন্‌স্পেক্‌টর কিন্তু বেশ দেখতে' আজকাল বাঙালী পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে বেশ ভালো ভালো

চেহারা দেখা যাচ্ছে। আমার ছেলেবেলায় পুলিশ সার্জেণ্ট হবার খুব শখ ছিল...”

তার কথার মাঝখানে ডাঃ বাজপেয়ীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।—“ফোনে যে কোনো আওয়াজ নেই, মিসেস লাহিড়ী! একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।”

“সে কি!”—কণিকা ডাঃ বাজপেয়ীর কাছে ছুটে গেল।—“এই খানিক আগেই ত ঠিক ছিল, উনি বরাকরের একটা দোকানে ফোন করে বন্যার খবর নিলেন।”

হঠাৎ মধুসূদনের উচ্চহাসিতে সবাই চমকে উঠল।

“ফোনটাও গেছে তাহলে! ব্যস্, দুনিয়ার সব সম্পর্ক খতম। এই থই-থই জল, এই বাড়ি আর আমরা ক'জন। তার মধ্যে আবার একজন টিকটিকি অফিসার। বাঃ, নাটক যা জমবে!”—আবার মধুসূদনের হাসি আর থামতে চায় না।

“থামুন নাটক না কি হলো আগে দেখুন। বিয়োগান্ত হলে এত খুসি থাকবে কি?” বীরস্বামী-ই ধমক দিলেন,—“এটা হাসির ব্যাপার নয়।”

মিস্ ধর সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন,—“ফোনের লাইন কেউ ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছে। তুমি, তুমি মধুসূদন কোথায় ছিলে এতক্ষণ?”

“আমায় সন্দেহ করছেন!”—মধুসূদন আবার হেসে উঠল,—‘কাটতে চাইলেও আমার দ্বারা ও-কাজটি হ'ত না। ইলেকট্রিক-টিলেট্রিকে আমার বড্ড ভয়। কখন কোথায় শক্ খেয়ে মরি আরকি? কিন্তু আপনিই—হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে মধুসূদন বললে, “আপনাকে পেছনের দিক দিয়ে ভেজা কাপড়ে যেন আসতে দেখলাম নিচে থেকে! আমি চিলের ছাদ থেকে বন্যার দৃশ্য দেখেছিলাম কিনা।”

“আমি।—মিস্ ধর একেবারে আগুন।—“আমি ত আমার আমি

একটা জিনিস আনতে গেছলাম। ওপর থেকে জানলা দিয়ে পড়ে গেছল।"

"কি পড়ে গেছল।" —বীরস্বামীই জিজ্ঞাসা করলেন।

"তাতে আপনাদের কি দরকার?" মিস ধর রেগে ঘর থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রবীর ও ইন্‌স্পেকটর ঘোষালকে ফিরতে দেখে তাঁকে থামতে হ'ল।

ঘোষাল মিস্‌ ধরের মুখ দেখেই কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ব্যাপার কি,—কি বলে .?"

"আমার নাম মিস্‌ ধর। —মিস্‌ ধর নিজেই ঝাঁঝালো গলায় জানালেন।

"তা, মিস ধর, হঠাৎ এত চটেছেন কেন? —একটু মধুর ভাবেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন।

"চটব না। এত বড় আস্পর্ধা। বলে কি-না আমি ফোনের তার কেটেছি!"

"তা ত বলিনি মিস্‌ ধর "—মধুসূদন আরো কি বলতে যাচ্ছিল, ঘোষাল বাধা দিয়ে বললেন,—"ফোনের তার কি কাটা নাকি?"

"কাটা কি-না জানি না।"—ডাঃ বাজপেয়ী বুঝিয়ে দিলেন,—'কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আশ্চর্য!"—ঘোষাল এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। খানিক নাড়াচাড়ার পর হতাশ মুখ করে ফিরে এসে বললেন, —"নাঃ একদম dead! বন্যার দরুণ অবশ্য খারাপ হতে পারে। কিন্তু তা নয় বলেই সন্দেহ হচ্ছে।"

একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে ঘোষাল পকেট থেকে একটা নোটবই বার করলেন। তারপর সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—"চাকর-বাকর বাদে এখানে ত আপনারা সবাই উপস্থিত?"

কণিকা জানালে,—"না, বেণীবাবু বলে আর একজন আছেন। তিনি বৃদ্ধ লোক, কাল এই দুর্যোগের মধ্যে এসে অসুস্থ হয়ে ঘরেই আছেন।"

"আচ্ছা, তিনি ছাড়া আপনারা সবাই এখানে আছেন। মিঃ লাহিড়ী ও কণিকা দেবীর কাছে কয়েকটা কথা আমার জানবার আছে। সেটা সেরেই আমি আসছি। আপনারা তৎক্ষণ অনুগ্রহ করে এখানে থাকলে ভালো হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালের অনুরোধে প্রবীর ও কণিকা পাশের ছোট লাইব্রেরী-গোছের ঘরটিতে গিয়ে বসল।

ঘোষাল দরজাটা ভালো করে বন্ধ করার পর কণিকা আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি ব্যাপার বলুন, মিঃ ঘোষাল! কিছু অন্যায় কি আমরা করেছি?"

"অন্যায় করেছেন!" ঘোষাল সবিস্ময়ে খানিক কণিকার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন,—"না, না, সে-সব কিছু নয়। আপনারা ভুল বুঝেছেন বলে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে আমি আসিনি, আপনাদের বিপদ যাতে না হয় সেই জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

"বিপদ?—আমাদের কি বিপদ?"—প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"বিপদ মোক্ষদা দেবীর খুন হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। কলকাতায় গিরি মাঝি লেনের সে ঘটনার কথা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে?"—ঘোষাল দুজনের দিকেই চাইলেন।

"হ্যাঁ পড়েছি।"—স্বীকার করল কণিকা—"কে না পড়েছে?"

"প্রথমে আমি জানতে চাই যে সেই মোক্ষদা দেবীর সঙ্গে আপনাদের কারুর পরিচয় ছিল কি-না?"

"নামও কখনও শুনিনি!"—বললে প্রবীর। কণিকাও সায় দিল।

"আমিও তাই ভাবছিলাম।"—ঘোষাল একটু থেমে বললে,—"কারণ গিরি মাঝি লেনে আসবার আগে মোক্ষদা ঠাকরুণ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তখন সবাই তাঁকে মিসেস এম, ডি, বলেই জানত। ওইটেই তাঁর চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আসল নাম যে মোক্ষদা-মণি দাস, তা অনেকে জানতই না। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটা অনাথাশ্রমের ম্যানেজারী করতেন। 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের কথা শুনেছেন বোধ হয়? অনাথাশ্রমের কেসটা নিয়ে কাগজে তখন খুব হৈচৈ হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা অনাথ হয়েছিল, এমন অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে থাকত। তার মধ্যে তিনটি ভাই-বোন ছিল। অনাথাশ্রমের ছেলে-মেয়েদের ওপর ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস এম, ডি, অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। তিন-ভাই-বোন সেই অত্যাচারে একদিন পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী তাদের অত্যন্ত মারধোর করেন। একটি ভাই তাতেই জখম হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। মিসেস এম, ডি,-র কথা সাধারণে জানতে পারেনি, কিন্তু তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সেই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ কেস্ করে। বিচারের সময়েই মিসেস এম, ডি,-র স্বামী কেমন করে পালিয়ে যান। কিন্তু মানুষের বিচার এড়িয়েও বিধাতার বিচারকে ফাঁকি দিতে পারেননি। তার কয়েকদিন বাদেই মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মারা যান। কেস্‌টা তাতে চাপা পড়ে যায়। মিসেস এম, ডি,-ও অনাথাশ্রম ছেড়ে দিয়ে একটু, ভোল পাল্টে ওই গিরি মাঝি লেনে এসে ওঠেন।"

বিবরণ শেষ করে ঘোষাল একটু থামলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—"এই মিসেস এম, ডি,-কে কেউ আপনারা চিনতেন, বা, এই অনাথাশ্রমের সঙ্গে কোন সংস্রব আপনাদের ছিল?"

প্রবীর কণিকা দুজনেই দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়ল।

কণিকা তারপর জিজ্ঞাসা করল,—"কিন্তু আমাদের এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"করছি আপনারা বিপন্ন বলে।"

"আমরা! আমরা কেন বিপন্ন হব?"—কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"বিপন্ন ত হয়েই আছেন, শুধু কেন হয়েছেন সেইটেই বোঝাবার চেষ্টা করছি।"—ঘোষাল একটু হেসে আবার বললেন,—"জানেন বোধ হয় যে, খুনীর পকেটের একটা হ্যাণ্ডবিল পুলিশ পেয়েছে? সে হ্যাণ্ডবিল আপনাদের এই স্বাস্থ্যনিবাসেরই বিজ্ঞাপন।"

"শুধু সেই হ্যাণ্ডবিল খুনীর পকেটে ছিল ব'লেই এই স্বাস্থ্য-নিবাসে সে হানা দেবে, বুঝতে হবে?"—প্রবীরের স্বরটা অবিশ্বাসের।

"না, শুধু তাই জন্যে নয়। সে হ্যাণ্ডবিলের পেছনে পেন্সিলে কয়েকটা কথাও লেখা ছিল। পুলিশের পক্ষে সে লেখা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।'

"কি লেখা ছিল? কারুর নাম?—উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

"না, নাম নয়। লেখা ছিল—'গিরি মাঝি লেনে শুরু, স্বাস্থ্য-নিবাসে শেষ। সেই জন্যেই জানতে চাইছি মিসেস এম, ডি,-র বা তাঁর সেই 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনাদের কোন সংস্রব ছিল কি-না। আপনাদের না থাক, বোর্ডাদের আর কারুর ছিল নিশ্চয়। নইলে খুনীর ও-লেখার কোন মানে হয় না"

"মানে হয়ত সত্যিই নেই!"—প্রবীর তার সন্দেহটা জানালে।

ঘোষাল হেসে বললে,—"অত সহজে পুলিশ ত আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারে না?"

"তার মানে এখানেও কেউ খুন হবে, বলতে চান?"—কণিকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল ধীরে ধীরে বললেন,—"আপনাদের আমি ভয় পাওয়াতে চাইনি কিন্তু আমাদের অনুমান তাই। খুনীর অভিসন্ধি যাতে ব্যর্থ করা যায় সেই জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের আন্তরিক সাহায্য পেলে আশা করি আমি বিফল হব না।" —ঘোষালের গলার স্বরে একটু আবেদনের সুরই পাওয়া গেল।

"কিন্তু, এই দুর্যোগে খুনীর পক্ষে এখানে আর আসা সম্ভব?"—প্রবীর তার মনের সন্দেহটা ব্যক্ত করলে।

ইন্স্পেক্টর ঘোষাল একটু যেন অনুকম্পাভরে বললেন,—"আপনি তাই ভেবে আনন্দে আছেন বুঝি? কিন্তু খুনীর আর আসবার দরকার নেই, এমনও ত হতে পারে।"

"তার মানে?"—কনিকা অবাক হয়ে ঘোষালের দিকে তাকাল।

"তার মানে, সে হয়ত আগেই এখানে এসে বসে আছে।"

"তা কি করে হতে পারে! এক বীরস্বামী ছাড়া বোর্ডাররা সবাই আগে থাকতে চিঠি দিয়ে ঘর রিজার্ভ করে এসেছেন—"

"আগে থাকতে চিঠি দেওয়ার মত এই খুনের ব্যাপারও সব আগে থাকতে প্ল্যান করা। তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলবেন না। গত শুক্রবার গিরি মাঝি লেনে মোক্ষদা দেবী খুন হয়েছেন। আপনার সমস্ত বোর্ডার-ই এসেছেন তারপরে।"

"তাহলে কি বলতে চান, সেই 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সেই তিনটি ভাইবোনেরই কেউ এই ব্যাপারে জড়িত? তারা ত নেহাত বাচ্চা।"

"বাচ্চা তখন ছিল। আজ এত বছর বাদে কি আর তাই আছে?"

"কিন্তু একজন ত মারা গেছে।

"হ্যাঁ, যে মারা গেছে সে ছিল সবচেয়ে ছোটো। বয়স তখন তার দশ মাত্র। তার বড় ভাই এর বয়স তখন পনরো, ষোল; আর বোনের বারো, বড় ভাই কিছুকাল বাদে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে যায়।

বোনটি কোনো একটি ভালো পরিবারে জায়গা পায়। কিন্তু সে পরিবারের কর্তা গিন্নী দুজনেই হঠাৎ পর পর মারা গেলে কোথায় যে যায়, কোনোও খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"সেই বড় ভাই-ই এ সবের মূলে আছে সন্দেহ করেছেন ? কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে তাহলে ও একমাত্র—"এই পর্যন্ত বলেই কণিকা চুপ করে গেল। কণিকা কি যেন একটা কথা চেপে গেল বুঝেও ঘোষাল তা জানবার চেষ্টা করলেন না।

শুধু তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—"বয়স ত ভাঁড়ান যায় মিসেস লাহিড়ী!"

"হ্যাঁ, তা যায়।"—বলে কেমন যেন একটু বিব্রত ভাবে কণিকা রান্নাবান্নার ব্যাপারটা একটু তদারক করবার জন্যে একবার রান্নাঘরে যাবার অনুমতি চাইলে।

"না না, এর আবার অনুমতি চাইবার কি আছে!"—ব'লে কণিকাকে ছেড়ে দিয়ে ঘোষাল প্রবীরকেও বোর্ডারদের কাছে গিয়ে তাদের প্রত্যেকের কয়েকটা বিবরণ একটা কাগজের টুকে রাখতে বললেন।

"আপনি এই সাধারণ খবরগুলো নিয়ে রাখুন। আমি খানিক বাদেই যাচ্ছি!"—বলে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষাল ওপরের তলাটা একবার ঘুরে এসে প্রথমে রান্নাঘরেই গেলেন। সেকেলে বিলিতি কায়দার রান্নাঘর। জায়গা প্রচুর।

"আপনার কাজ কি হ'য়ে গেছে, মিসেস লাহিড়ী?"—একটু সঙ্কুচিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

হ্যাঁ, এই হয়ে গেল বলে। রামসেবককে একটু মসলা বাটতে পাঠিয়েছি, চাকরটাও ওপরে সব পরিস্কার করতে গেছে। এই ডালটা ন দেখলে পুড়ে যাবে।"—একটু লজ্জিত ভাবে কণিকা বললে,—"যা খাওয়া আজ খাওয়াব, গোয়েন্দাগিরি ভুলে যাবেন।"

"আমায় খেতে দেবেন বলছেন, এই ত আমার ভাগ্য।"—ব'লে ঘোষাল হাসলেন।

ডালটা নাড়তে নাড়তে কণিকা বললে,—"কিন্তু দেখুন, যত ভাবছি, আমার কেমন সব আজগুবি মনে হচ্ছে।"

"আজগুবি নয় মিসেস লাহিড়ী, একেবারে খাঁটি সত্যি।"—ঘোষাল রান্নাঘরে পাতা একটা ছোট চৌকিতে গিয়ে বসলেন।—"কাগজে খুনীর পোশাকের বর্ণনা ত পড়েছেন। আপনাদের এখানে তিনটি ঘরেই ত সেরকম ওয়াটারপ্রুফ আর বর্ষাতি টুপি টাঙানো রয়েছে দেখলাম। তিন-জনের যে-কেউ হয়ত সেদিন কলকাতায় ছিলেন।"

"কিন্তু যাঁদের ওয়াটারপ্রুফ দেখেছেন, তাঁদের কেউই কলিকাতার লোক নয়। একটা বীরস্বামীর। তিনি ত পরেই এসেছেন। আর দুটো মধুসূদন আর আমার স্বামীর। আমার স্বামী ত এখানেই থাকেন, আর মধুসূদন পাটনা থেকে এসেছে।"

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"তবু এখানকার কেউ যে খুনের দিন গত শুক্রবারে কলকাতায় গেছলেন, তার ত স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।"

"প্রমাণ। কি প্রমাণ?"—কণিকার ডাল-নাড়া থেমে গেল

মেঝে থেকে খবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে ঘোষাল বললেন,—"এই কাগজটা।"

"কিন্তু ওটা ত আনন্দবাজার। আমরা ওর গ্রাহক।"—কণিকা ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

কাগজের পাতার মাথার দিকটা দেখিয়ে ঘোষাল বললেন,—"হঁা, আপনারা গ্রাহক হিসেবে যে কাগজ পান সেটা ডাক এডিশন্, মানে মফঃস্বল-সংস্করণ। কিন্তু এ কাগজটা কলকাতার। সেখানেই কেনা হয়েছে।"

"কিন্তু ও কাগজ—ও কাগজ কোথা থেকে এল!"—কণিকা ভাববার চেষ্টা করলে।—"পুরোনো কাগজ ব'লে আমি হল থেকে ওটা রান্নাঘরের কাজে লাগাতে নিয়ে এসেছিলাম।"

"মনে করতে চেষ্টা করুন, কে কাগজটা এনেছিল?"—ঘোষাল কণিকাকে উৎসাহ দিলেন।

"না, মনে প'ড়েও পড়ছে না।"—বলে কণিকা হতাশভাবে ঘোষালের দিকে চাইল।

"চেষ্টা করুন। এক সময়ে ঠিক মনে পড়ে যাবে।"

"তাহলে?"—কণিকা সভয়ে প্রশ্নটা আর শেষ করতে পারল না।

"হ্যাঁ, তাহলে একটা সূত্র অন্ততঃ পাওয়া যেতে পারে এ রহস্যের।"—ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"এখন বুঝতেই পারছেন কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস খুব নিরাপদ জায়গা আর নয়। আচ্ছা আপনারা ত সবে এটা খুলেছেন। এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে?"

"হোটেলে থাকবার অভিজ্ঞতা আছে, চালাবার নয়। বিয়ের পর বাসার অভাবে হোটেলেই বেশির ভাগ কাটিয়েছি কি-না।"

"বিয়ে আপনাদের কতদিন হয়েছে? কিছু যদি মনে না করেন অবশ্য—"—ঘোষাল একটু কুণ্ঠিত।

"এই দেড় বছর মাত্র।"

একবার যেন ইতস্ততঃ করে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন,—"জানা-শোনা অনেক দিনের ?"

কণিকা লজ্জিতভাবে বললে,—"না, একরকম হঠাৎ। উনি তখন সদাগরী জাহাজে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আমি এয়ার-হোস্টেসের কাজ করি। বোম্বেতে ক'দিনের দেখা। তারপরই বিয়ে। আমি এক দাদুর কিছু টাকা পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলাম, ওঁকেও ছাড়ালাম। তারপর দেশে ফিরে হা-ঘর জো-ঘর করে দেড় বছর কাটিয়ে এই স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা।"

"আপনার স্বামী কি কলকাতার লোক ?"

"না, ওঁরা প্রবাসী বাঙালী। আগ্রাতে বুঝি দু-তিন পুরুষ কেটেছে।"—বলতে বলতে কণিকার মনে হ'ল স্বামীর আগের জীবনের কথা কতটুকুই বা সে জানে। প্রবীর সে বিষয়ে কখনো বিশেষ কিছু বলেনি। সেও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অতীত নিয়ে মাথা-ঘামাবার দরকারই বা কি, বর্তমান যদি মধুর হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন ত বলি,"—ঘোষাল একটু হাসলেন,—"হোটেল চালাবার মত বয়স আপনাদের হয়নি। আপনি ত বলতে গেলে—"

কণিকা একটু হাসল,—তা বয়স কম কি ? এই ত তেইশ হ'ল আমার আর—"

কণিকার কথা শেষ হবার আগেই প্রবীর ঘরে ঢুকল।

"ওঁদের ত যা যা বলেছেন বুঝিয়ে দিয়ে মোটামুটি খবর নিয়েছি। এবার চলুন।"

"হ্যাঁ আসুন মিসেস লাহিড়ী।"—বলে ঘোষাল এগিয়ে গেলেন

প্রবীর ও কণিকার সঙ্গে ঘোষাল ঘরে ঢুকতেই সেখানকার গুঞ্জন থেমে গেল।

তারপর প্রথমেই শোনা গেল মিস্ ধরের ঝাঁঝালো গলা—"যা জানতে চান চটপট জিজ্ঞাসা করুন। ভালো হোটেলেই এসেছিলাম। একদণ্ড এসে অবধি স্বস্তি পেলাম না। দোষ পুলিশের। কোথায় কলকাতায় কি হয়েছে তার খোঁজ নিতে এসেছে এখানে? সব অকর্মার ধাড়ি। নইলে এতদিনে একটা খুনের কিনারা হয় না।"...

মিস্ ধরের মুখের তোড় বোধহয় সমানে চলত, কিন্তু ঘোষাল হাত তুলে তাঁকে থামালেন।

"আপনারা ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছেন। এখন শুধু একটি প্রশ্ন আমার করবার আছে।"—ঘোষাল সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললে,—"চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনারা কে কে জড়িত ছিলেন?"

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই একদৃষ্টে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে।

"আমার কথাটার মানে ভালো করে নিশ্চয় বুঝেছেন।"—ঘোষাল আবার বললেন,—আপনাদের একজনের বিপদ একেবারে আসন্ন। কার মাথায় সেই খাঁড়া ঝুলছে আমি জানতে চাই।"

তবুও কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ঘোষালের গলার স্বরে এবার একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল।—"আচ্ছা আমি এক এক জন করে সকলকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি..."—ঘোষাল প্রবীরের দেওয়া কাগজটা একবার দেখে বললেন,—"আপনি বলুন, মিঃ বীরস্বামী।"

"আমি!"—বীরস্বামীর মুখে একটু হাসির আভাস খেলে গেল,—

"আমি ত এদিকের লোক নই। নানা জায়গা ঘুরে বেড়াই। কলকাতার ওই ব্যাপারের কথা শুনিনি পর্য্যন্ত।"

ঘোষাল মিস্ ধরের দিকে ফিরলেন,—"আপনি?"

"আমি,—আমি?"—মিস্ ধর একটু যেন থতমত খেয়ে বললেন,—"এসব প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না। আমার কোনোও সম্পর্কই নেই ও-ব্যাপারের সঙ্গে।"

"মধুসূদনবাবু?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া আর কাকে?"—ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"আপনার নামই ত মধুসূদন দত্ত।"

"হ্যাঁ তবে আমি ত তখন নেহাত ছোটো!"—মধুসূদন যেন অনুশোচনার সঙ্গে বললে,—"এমন একটা দারুণ ব্যাপার জানবার বয়সই হয়নি। তা যদি..."

"ডাঃ বাজপেয়ী!"—মধুসূদনকে কথা বাড়াতে না দিয়ে ঘোষাল ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে ফিরলেন।

ডাঃ বাজপেয়ীর উত্তর দিতে একটু যেন দেরী হ'ল। "আমি—দাঁড়ান মনে করি—হ্যাঁ, আমি তখন ব্যাঙ্গালোরে একটা লেবরেটরিতে কাজ করি।"

"তাহলে কেউই আপনারা অনাথাশ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করছেন না?"—ঘোষাল হতাশ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—"তাহলে কেউ যদি আপনারা খুন হ'ন, তার জন্যে নিজেই দায়ী হবেন।"

কথাটা ব'লে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর মধুসূদন হেসে উঠে বলল,—ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর কিন্তু। এই আমরা ক'জন। এর মধ্যে একজন মারা পড়বেন!"

চুপ করো ফাজিল ছোকরা!"—মিস্ ধর ধমকে উঠলেন।

কিন্তু মধুসূদন অত সহজে থামবার ছেলে নয়। মিস্ ধরের দিকে ফিরে সে বললে,—"ধরুন, চুপিচুপি ঠিক আপনার পেছনে গিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আপনি ফিরতে-না-ফিরতেই গলায় একটি ফাঁস। বাস।

"থামুন মধুসূদনবাবু!—প্রবীর সরোষে যেন গর্জন ক'রে উঠল,—রসিকতার একটা সীমা আছে।

"কিন্তু এটা যে সীমা-ছাড়ানো রসিকতা। আর রসিক সেই খুনে আমাদের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে।"—হঠাৎ সজোরে হেসে উঠে সে সকলের দিকে চেয়ে বললে,—"নিজেদের মুখগুলো যদি আপনারা দেখতে পেতেন!"

হাসতে হাসতেই মধুসূদন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"অসভ্য বেয়াড়া মার্কেট!"—মিস্ ধর তিক্ত স্বরে বললেন,—"পাগলা-গারদে রেখে ওর চিকিৎসা দরকার।"

"চিকিৎসা হয়ত আমাদের অনেকেরই দরকার, মিস্ ধর।"—কণিকা মধুসূদনের পক্ষ নিয়ে না ব'লে পারলে না,—মধুসূদনের একটু মাত্রাজ্ঞান কম। কিন্তু তার কারণও আছে। শুনলাম একবার ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে ও নাকি বারো ঘণ্টা গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে ছিল। নেহাত ভাগ্যের জোরে উদ্ধার পায়। তাতেই একটু কেমন হয়ে গেছে।"

"বিপদে পড়লেই যদি মাথা খারাপ হয়, অমন ননীর পুতুলের তাহলে দুনিয়ায় বাস করাই উচিত নয়। দাঙ্গার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে..."

হঠাৎ মিস্ ধরকে থামিয়ে ডাঃ বাজপেয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বলে উঠলেন, "আপনি? দাঁড়ান। ঠিক দাঙ্গার সময় আমিও কলকাতায় এসেছিলাম। আপনার ছবি যেন তখন খবরের কাগজে দেখে'ছি। গোড়া থেকেই তাই আমি ভাবছিলাম কেমন আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে।"

"আপনার স্মৃতিশক্তি ত খুব।"—বীরস্বামী একটু বিদ্রুপের সুরে

বললেন,—"খবরের কাগজের ছবি এতদিন আপনি মনে করে রেখেছেন।"

"মনে রাখবার একটু কারণও যে আছে।"—ডাঃ বাজপেয়ী নিজের সাফাই দিলেন,—ওঁর বিবৃতি যে বড় করে ছবি শুদ্ধ কাগজে বেরিয়েছিল আর সে বিবৃতি একটু অসাধারণ। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।"

"হ্যাঁ।—মিস্ ধর একটু গর্বভরেই স্বীকার করলেন,—"আমি তিন দিন মড়ার গাদায় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে ছিলাম। তিন দিন বাদে উদ্ধার যখন হই, তখন যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, তাদের…"

হঠাৎ মিস্ ধর থেমে গেলেন।

"থামলেন কেন? বলুন, মিস্ ধর।"-ডাঃ বাজপেয়ীর স্বর বেশ রূঢ়।

"না, বলছিলাম,—তিন দিন বাদে উদ্ধার পেয়ে আমায় একটা জায়গায় নিয়ে যায়।"

"সাধারণ জায়গায় নয়, সেটা 'চাঁপাখোলা' আশ্রম।" ডাঃ বাজপেয়ী কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ, 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রম-ই হ'ল। তাতে হয়েছে কি?"—মিস্ ধরের ঝাঁঝটা যেন এখন করুণ প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে।

"হয়েছে এই যে, ওই তিনটি ভাইবোন আপনার বাড়িওয়ালারই ছেলেমেয়ে। আপনার সঙ্গেই তারা ওই আশ্রমে আশ্রয় পায়। তাদের আপনি চিনতেন।"

"হ্যাঁ, চিনতাম, কিন্তু তাই ব'লে তাদের ভার নিতে বললে আমি নেব কোথা থেকে। আমি একলা মানুষ। ও-সব ঝামেলা আমার পোষায়।"—মিস্ ধর যেন কাতরভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলেন।

"তাহলে ওই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনারও সংস্রব ছিল? আপনাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি ওদের ভার নেন নি?"—প্রবীরই এবার জিজ্ঞাসা করলে।

"না, নিইনি, নিইনি।"—মিস্ ধরের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল,—"তখন

কি করে জানব যে ওই অবস্থা তাদের ওখানে হবে? আমি ত জেনেশুনে তাদের ক্ষতি করিনি।"

"কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালকে একথা তাহলে জানালেন না কেন?" —ডাঃ বাজপেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস্ ধর এবারে নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন,—"জানাতে যাবই বা কেন? যত সব বাজে প্রশ্ন! পুলিশ কি-ই বা করতে পারে! তাদের সাহায্য না হ'লেও আমার চলবে।"

"কিন্তু তবু কথাটা জানালে ভালো করতেন।"—ব'লে ডাঃ বাজপেয়ী চলে যাচ্ছিলেন। বীরস্বামীর কথায় তাঁকে থামতে হ'ল।

"কিন্তু আপনি এত কথা জানলেন কি করে, ডাঃ বাজপেয়ী? শুধু খবরের কাগজের ছবি দেখে আর বিবৃতি পড়ে ত এত জানবার বোঝবার কথা নয়।"

"আমি—মানে—" ডাঃ বাজপেয়ীকে এই প্রথম একটু অপ্রস্তুত দেখা গেল,—"আমার জানা-বোঝাটা খানিকটা স্মরণশক্তি, খানিকটা অনুমান থেকে ব'লে ধরে নিতে পারেন।"

ডাঃ বাজপেয়ী আর সেখান দাঁড়ালেন না।

কণিকা এতক্ষণ মিস ধরকে একটু বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। এবার সে বললে,—"হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। আপনি 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমে অনেক দিন ছিলেন।"

"তুমি! তুমি কি করে জানলে কণিকা?"—প্রবীর তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

কণিকা কিছু বলবার আগেই বীরস্বামীর হাসি শুনে সবাই চমকে উঠল। বীরস্বামী নিজের মনেই খুক্ খুক্ করে হাসছেন। তাঁর দিকে সকলকে চাইতে দেখে তিনি অপরাধীর মত বললেন,—"আমায় মাফ করবেন। মধুসূদনবাবুর মত আমারও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা যত ভয়ঙ্কর, তত মজার লাগছে আমার।"

"ও! আপনার মজার লাগছে বুঝি!"—ঘোষাল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

"মাফ করবেন, ইন্স্পেকটর সাহেব। মাফ করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। নাক-কান-মলা খেয়ে আমি চলে যাচ্ছি।"

বীরস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু যাওয়ার ধরনে মোটেই লজ্জা পাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। যেন ভেতরে-ভেতরে একটা মজা উপভোগ করছেন, আর সে কাজটা কাউকে জানতে দিতে চান না, এমনি তাঁর মুখের ভাব। এবারও কণিকার মনে হ'ল চটপটে চলার ভঙ্গিটা মোটেই পাকা-চুলের সঙ্গে খাপ খায় না।

"এক কিম্ভুতকিমাকার!" - মন্তব্য করলে প্রবীর।

"ভেতরে গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়। চেহারাটাই কেমন শয়তানের মত।" —ঘোষালও মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন, —"ও রকম লোককে এক চুল বিশ্বাস করতে নেই!"

কণিকা হঠাৎ বলে উঠল,—"আপনারও তাই মনে হয়েছে তাহলে। কিন্তু ওঁর বয়স ত অনেক বেশী—তবে সত্যিই কি তাই? ভদ্রলোকে যেন ঠিক বুড়ো সেজে থাকেন মনে হয়। হাঁটেন কিন্তু জোয়ান পুরুষের মত। হয়ত বুড়োর ছদ্মবেশ ক'রে থাকেন। আপনার কি মনে হয় মিঃ ঘোষাল?"

ঘোষাল একটু যেন রূঢ় ভাবেই কণিকাকে দমিয়ে দিলেন,—"আজে বাজে জল্পনা করে কোনো লাভ আছে কণিকা দেবী? অনুমান নয়, আমাদের প্রমাণ দরকার। আপাততঃ ফোনটা মেরামত করবার ব্যবস্থা না করলে মিঃ লাহিড়ী, দেখি কি করা যায়।"

প্রবীরকে নিয়ে ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন।

নিস্তব্ধ দুপুর। থই থই বন্যার জলের মাঝখানে কল্যানেশ্বরী স্বাস্থ্য নিবাসের বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলে সেখানে অত বড় একটা উদ্বেগ আশঙ্কাময় নাটকের রহস্য নাটিকার ভূমিকা চলছে কেউ ভাবতে পারত না। অস্থির বন্যা তরঙ্গের মাঝখানে বাড়িটা যেন শান্ত স্থির সমাহিত।

সে বাড়ির গোণাগুণতি বাসিন্দার প্রত্যঙ্গে তখন কিন্তু নিজের নিজের গোপন উদ্বেগ ও ভাবনায় অস্থির। এক এক করে তাদের গতিবিধি একটা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোষাল টেলিফোনের তারটা বাড়ীতে যেখান দিয়ে গেছে, দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে প্রবীর।

"ওপরে Extension line গেছে না?"—প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

"হ্যাঁ, ওপরের হলে একটা টেলিফোন আছে।"

"আচ্ছা দেখে আসি।"—বলে ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

সেই সময়টাতে বীরস্বামীকে এদিক ওদিক একটু ঘুরে ওপরের হল-ঘরে ঢুকতে দেখা গেল।

হল ঘরের এক কোণে বড় একটা অর্গ্যান আগেকার দিনের চিহ্ন স্বরূপ প'ড়ে আছে। ওপরের ঢাকনাটা বীরস্বামী এক আঙুলে ক'টা চাবি টিপে একটু বাজাবার চেষ্টা করলেন।

না, অর্গ্যানটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। একটু বেসুরো হ'লেও এখনো আওয়াজ বার হয়।

বীরস্বামী বাজাবার চরকি-টুলটায় ব'সে এক-আঙুলে একটা গানের সুর বাজাতে লাগলেন। গানটা যার জানা সে বুঝতে পারত, সেটা হালফিল হুজুক-তোলা একটা ফিল্মের গান।

মধুসূদন তার নিজের শোবার ঘরে শিস দিতে-দিতে পায়চারি করছিল। হঠাৎ শিস থামিয়ে সে বিছানার ধারে ব'সে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে হতাশ ভাবে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল,—"পারব না, আমি পারব না!"

তারপর নিজেকে বুঝি সে সামলে নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিজে-কেই যেন উৎসাহ দিলে, —"না—শক্ত আমায় হতেই হবে।"

প্রবীর নীচের ঘরে টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ টেবিলের ঢাকনার নীচে একটা আধখানা-বেরিয়ে-আসা কাগজ তার চোখে পড়ল। কাগজটা বার করে দেখে তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। কাগজটা কলকাতার এক নাম-করা ষ্টেশনারী দোকানের রসিদ।

রসিদের তারিখ ৬ই নভেম্বর।

৬ই নভেম্বর ত সেই শুক্রবার। সেদিন নিজে সে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিল না। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরেছিল।

কণিকা তাহলে কলকাতাতেই গেছল তারই মধ্যে!

কণিকা রান্নাঘরে বিকালের জলখাবারের ব্যবস্থা করছিল। ভাগ্যে সেদিন বরাকরে গিয়ে গাড়ি-ভর্তি জিনিসপত্র এনেছিল তাই। নইলে এতগুলো মানুষকে ত উপোস করে মরতে হ'ত। কিন্তু জলখাবারের কিছু অদল-বদল করা ত অসম্ভব।

যা জিনিসপত্র ভাঁড়ারে আছে তা দিয়ে জলখাবারের কী নতুন কিছু করা যায়—ভাবতে-ভাবতে প্রথমে খবরের কাগজের নতুন রান্নার নির্দেশ, এবং তা থেকে সেদিনের সেই আনন্দবাজার পত্রিকার কথা মনে পড়ল।

কার হাতে কাগজটা সেদিন যেন দেখেছিল, কিছুতেই মনে পড়ছে না। হল-ঘরে ডাঃ বাজপেয়ী কি?—না না—নন, কাগজটা কে যেন এনে এক কোণে ফেলে—

হঠাৎ কণিকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মনে হ'ল যে নিশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে।

না, না—এ হতে পারে না! কখনো হতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে রান্নাঘর থেকে বার হল।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। না, নিস্তব্ধ ঠিক নয়। কোথা থেকে অস্পষ্ট ভাবে শিস শোনা যাচ্ছে। সেই হতচ্ছাড়া ফিল্মের গানটার সুর।

না, আপাততঃ তার আবার রান্নাঘরেই ফিরে যাওয়া ভালো। সেখানে অন্ততঃ খানিকটা একা-একা সমস্ত ব্যাপারটা ভাবা যাবে।

ডাঃ বাজপেয়ী ওপরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলেন।

"কেমন আছেন আজ বেণীবাবু?"

বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বৃদ্ধ বেণীবাবু শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছেন। বইটা মুড়ে রেখে হাসিমুখে বললেন,— "ভালো, বেশ ভালো।"

বাঁধানো দাঁতগুলো খোলা থাকার দরুন কথাগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট।

"তা ভালো হয়েও বিছানায় শুয়ে-শুয়েই কাটাবেন? একটু উঠে হেঁটে বেড়াবেন না!"

বেণীবাবু ফোকলা মুখে বললে,—"বেড়াবার জায়গা কোথাও রেখেছেন?" তারপর নিজেই আবার বললেন, "আমার এই শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম করবার জন্যেই আসা। আমার জন্যে ভাববেন না!"

"আচ্ছা, তাহলে বিশ্রামই করুন।"—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক একবার চেয়ে ডাঃ বাজপেয়ী হঠাৎ মেথরের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

নিচে নেমে আবার তাঁকে সতর্কভাবে এদিক ওদিক চাইতে দেখা গেল। না, কেউ এদিকে নেই।

এবার তিনি সন্তপনে পেছনের দিকের একটা বড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের দরজাটা বন্ধ, তবে তালা দেওয়া নয়। একটা দড়ি দিয়ে কড়া-দুটো বাঁধা।

যা করতে চান, এই তার ঠিক সময়।

ডাঃ বাজপেয়ী ক্ষিপ্র নিপুন হাতে দড়ির বাঁধন খুলে ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন।

মিস ধর নিজে ঘরে ব'সে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। নিজের হলঘর থেকে জেদ করে এটা তিনি নিজের ঘরে আনিয়েছেন।

রেডিও শোনবার জন্যে নিচ-ওপর তিনি করতে পারবেন না, আর অন্য কারুর যখন আগ্রহ নেই তখন তাঁর ঘরে এটা থাকলে দোষ কি।

ওপরের ইলেকট্রিক লাইনের নতুন ফিউজ্‌টা লাগাবার সময়ে প্রবীরকে দিয়েই তিনি এ কাজটা করিয়ে নিয়েছেন।

প্রথমে চাবি ঘোরাতেই কি একটা বকবকানি শোনা গেল। বিরক্ত হ'য়ে চাবিটা আর একটু ঘোরাতেই একটা গান ভেসে এল।

কি ছাই গান! যেমন গানের কথা, তেমনি সুর!

গানটাও বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকালেন।—"আরে, আমি ভাবলাম..."

কি ভাবলেন তা আর না বলে মিস্‌ ধর রেডিও নিয়ে পড়লেন,—"কি সব আজে-বাজে গান যে দেয় ছাই! শুনলে গা জ্বালা করে।"

"শুনে আর কি হবে!"

"কিন্তু না শুনে কি করি? আগে জানলে এমন জেলখানায় আসতাম! চারিদিকে জল, আর তার মাঝখানে ঠুঁটো হয়ে কোন এক খুনে বদমাশের সঙ্গে দিন কাটানো! আমার অবশ্য ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস নেই!"

"বিশ্বাস সত্যি নেই?"

"তার মানে? কি,—কি ব্যাপার—"মিস্‌ ধর চীৎকার করে উঠলেন।

মিস্ ধরের চীৎকার মাঝখানে থেমে গেল। ওয়াটারপ্রুফের বেল্টটা নিপুণ হাতে ছুঁড়ে গলায় লাগিয়ে তখন ফাঁস টেনে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

রেডিওর চাবিটা আর একটু ঘুরিয়ে দিতেই, ফিল্মের সস্তা গানটা গাঁক-গাঁক করে বেজে উঠল।

অন্য কোনো আওয়াজ আর বিশেষ শোনা গেল না।

খুনী আনাড়ি নয়।

নিচের হল-ঘরে একটা দুঃসহ থমথমে আবহাওয়া। বৃদ্ধ বেণীবাবুও তাঁর বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছেন।

কণিকার মুখ এখনো একেবারে ছাই-এর মত সাদা। প্রবীর তাকে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি খেতে দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত শরীর তার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

মিস ধরকে চা দিতে গিয়ে সে-ই প্রথম তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

"আচ্ছা আপনি ভালো করে আর একবার ভেবে দেখুন, মিস ধরের ঘরে যাবার সময় আপনি কাউকে দেখতে বা কোনো কিছু শুনতে পান নি?"—ঘোষাল যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, একটা শিসের শব্দ! না—না, সেটা অনেক আগে। আমি যেন একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম।"

"কোথায়?"

কণিকা একটু ভেবে বললে,—"আশ্চর্য, আওয়াজটা যেন নিচে বাড়ির পেছনে মনে হয়েছিল।"

"ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করুন মিসেস লাহিড়ী, আপনার মনে করার ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে।"

"না, না—আমি কিছু মনে করতে পারছি না!"—কণিকা কাতর ভাবে মাথা নাড়লে।

"কেন ওকে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন?"—প্রবীর তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"কষ্ট আমি ইচ্ছে করে দিচ্ছি না, মিঃ লাহিড়ী। কিন্তু খুনের তদন্ত খুব মধুর কি হয়?"

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল আবার বললেন,—"মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখনও কত গুরুতর, আপনারা সবাই বুঝতে পারেননি। মিস্ ধর আমার কাছে সত্য কথা বলেননি তার ফল কি হয়েছে আপনারা জানেন। এখনও সব কথা যদি জানা না যায়, তাহলে আর কাউকে হয়ত জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

"আরো একজনকে ? কেন ?"—বৃদ্ধ বেণীবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন। বাঁধানো দাঁত পরে তাঁর কথাগুলো তখন অন্ততঃ স্পষ্ট।

"কেন ? তা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় তিন ভাইবোনের নামে তিনজনের প্রাণ নেওয়াই খুনীর উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সেই হ্যাণ্ডবিলের পেছনে যে কথাটা পেন্সিলে লেখা ছিল সেটাও মনে রাখা দরকার।—'গিরি মাঝি লেনে শুরু, স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ!' সে শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আমরা খুশিই হ'ব, কিন্তু তবু সাবধান হওয়াই উচিত।"

"কিন্তু সাবধান কি ভাবে হবেন ? বাইরে থেকে কারুর আসবার উপায় নেই। সুতরাং আমাদের একজন যে খুনী এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই একজন যে কে তা বোঝবার কোনো উপায় আছে কি ?—বীরস্বামীর গলার স্বরে পুলিশের ক্ষমতায় অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেল।

ঘোষাল একটু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন,—"সেই উপায়ই বার করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে যে বিবরণ আমায় দিয়েছেন, আমি আর একবার তা পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোট-বইটা বার করে ঘোষাল এক-এক করে পড়ে শোনালেন।

"মধুসূদন! আপনি বলছেন যে ঘর থেকে বার হননি ?'

'না'।—মধুসূদন যেন কেমন বদলে গিয়েছে। তার সে স্ফূর্তির উচ্ছ্বাস কোথায় গিয়েছে উবে।

'বেণীবাবু ?—না, আপনি ত বিছানা থেকে ওঠেননি জানি। আপনি প্রবীরবাবু! টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'—বললে প্রবীর।

বীরস্বামী ওপরের হল-ঘরে অর্গ্যান বাজাচ্ছিলেন ?"

"তাকে বাজানো বলে না।" বীরস্বামীই শুধু যেন এই ঘটনার পরও সমান তাজা আছেন।—"এক আঙ্গুলে একটা গান বাজাবার চেষ্টা করছিলাম।"

"কি গান ?"

"আপনাদের বাংলাদেশের এখনকার সবচেয়ে চালু গান। বিড়িওয়ালা থেকে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরাও যে গান গায়।"

"কি সে গান ?"—ঘোষাল একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনি জানেন না বুঝি ? সেই—একটা ফিলমের গান। পাশের ঘরে মধুসূদনবাবুও ত এই গানের সুরই শিস দিচ্ছিলেন।"

ঘোষাল ভুরু কুঁচকে মধুসূদনের দিকে তাকাতে সে যেন একটু বিব্রত হয়ে বললে,—ঠিক জেনেশুনে ও সুর ভাঁজিনি, নিজের অজান্তেই এসে গেছল।"

ডাঃ বাজপেয়ী এর মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, টেলিফোনের লাইন কি আপনা থেকেই খারাপ হয়ে গেছে না কেউ কেটে দিয়েছে ? কিছু জানতে পারলেন ?"

"পেরেছি। নিচের খাবার ঘরের বাইরের দেওয়ালেই তারটা কাটা। আমি সেই কাটা জায়গাটা তখন সবে খুঁজে বার করেছি, এমন সময় চীৎকার শুনলাম। কিন্তু চীৎকারটা যেন মাঝপথেই থেমে গেল মনে হ'ল। কিন্তু আপনি ডাঃ বাজপেয়ী। আপনি বলছেন বেণীবাবুর ঘরে গেছলেন ?"

'হ্যাঁ—মানে—তাঁর ঘরেই থাকিনি।'—ডাঃ বাজপেয়ী বেণীবাবুর দিকে চেয়েই যেন একটু বেশী বিব্রত হয়ে প'ড়ে বললেন,—"আমি আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম।

"তা হলে মিস্ ধরের চীৎকার ত আপনার শোনবার কথা। চীৎকারটা

হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছল কি ?" – ঘোষাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ – মানে সেই রকমই যেন মনে পড়ছে।

"এ ত যেন-যদির কথা নয় ডাঃ বাজপেয়ী।" – ঘোষালের স্বর বেশ কঠিন, – "স্মৃতিশক্তি ত আপনার ভালোই বলে শুনেছি।

"আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন মিঃ ঘোষাল – শুধু ঘোষাল নয় আর সকলেও প্রবীরের আচমকা এই কথায় একেবারে চমকে উঠল।

ঘোষালের মুখ-চোখ আত্মসংযমের চেষ্টাসত্ত্বেও লাল হয়ে উঠেছে, তখন।

"কোন্‌টা মিছিমিছি করেছি বলুন ?" – ভদ্রভাবে বলার' চেষ্টাসত্ত্বেও ঘোষালের গলার স্বর একটু অস্বাভাবিকই শোনাল।

"আসল কাজ না করে আর যাই করুন, তাতে মিছিমিছি সময় নষ্ট।" প্রবীর দৃঢ় ভাবে জানাল।

"আসল কাজটা কি ?" – এতক্ষণে ঘোষালের মুখ দিয়ে হাসি ফুটল।

"আসল কাজ, সবকিছু প্রমাণ যাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তাকে এখুনি গ্রেপ্তার ক'রে সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা।"

"সে কে ?" – ঘোষালের মুখ আবার কঠিন হয়ে গেল।

প্রবীর নাটকীয় ভাবে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই মধুসূদন কাতর ভাবে চীৎকার করে উঠল, – "না, না – আমি কিছু জানি না – এ সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, আমি জানি .."

"শান্ত হোন মধুসূদনবাবু।" – বৃদ্ধ বেণীবাবুই বলে উঠলেন।

"কিছু ভয় নেই মধু।" – কণিকা তার কাছে এসে তার হাতটা ধরে দাঁড়াল, – "কেউ তোমার বিরুদ্ধে নয়, তোমার কোনো ভয় নেই।"

ঘোষালের দিকে ফিরে কণিকা ব্যাকুল ভাবে বললে, —"বলুন মিঃ ঘোষাল, বলুন ওকে গ্রেপ্তার করবেন না!"

ঘোষাল নিজেই যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন হঠাৎ এই নাটকীয় ব্যাপারে। তিনি হেসে বললেন, —"আমি কাউকেই গ্রেপ্তার করছি না। গ্রেপ্তার করার জন্যে আমার প্রমাণ দরকার —এমন কোনো প্রমাণ আমি এখনো পাই নি।"

"যথেষ্ট পেয়েছেন।"—প্রবীর তীব্র স্বরে বললে,—কণিকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর আপনাদেরও বোধ হয় সকলের। সেই তিন ভাই-বোনের একজন যদি এখানে সত্যিই আছে মনে করেন, তাহলে সে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওর বয়স দেখুন, ওর ছেলে বেলার কথা জিজ্ঞাসা করুন .."

"তুমি একটু থামবে!"—কণিকার চোখে এমন একটা দীপ্তি যে প্রবীরকে থামতে হ'ল।"

কণিকা ঘোষালের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বললে,—"আপনার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা আলোচনা করবার আছে।"

"বেশ ত।"—ব'লে ঘোষাল সকলের দিকে চাইলেন।

"আমরা যাচ্ছি!"—বলে আর সবাই বেরিয়ে গেলেও প্রবীর দাঁড়িয়ে রইল।'

"তোমাকেও যেতে হবে!"—কণিকা দৃঢ় স্বরে বললে।

কণিকার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে প্রবীর এবার বেরিয়ে গেল।

"কি বলতে চান, বলুন।"—ঘোষাল উৎসুক দৃষ্টিতে কণিকার দিকে চাইলেন।

"শুনুন মিঃ ঘোষাল; আপনারা সবাই ধরে নিয়েছেন যে সেই তিন ভাই-বোনের যে বড়, সেই এসব ব্যাপারের মূলে আছে।"

"সেই রকম অনেকগুলো প্রমান যে পাওয়া গেছে।"

"কি পাওয়া গেছে।"—কণিকা উত্তেজিত ভাবে বললে,—"গিন্নি

মাঝি লেনের খুনীর মুখ কেউ দেখেনি। ওয়াটারপ্রুফের তলায় কে কম-বয়সী, কে বুড়ো কিছু বোঝা যায় না, নেহাত বেণীবাবুর মত অথর্ব যদি না হয়! এখানেও মিস্ ধরকে যে খুন করেছে—সে যুবক না প্রৌঢ় কে বলতে পারে।"

"কিন্তু প্রৌঢ় হ'লে তার এসব খুন করবার একটা কারণ ত চাই" ঘোষাল বললেন।

"কারণ কি কিছু থাকতে পারে না? আপনারা সেই তিনটি ছেলেমেয়ের কথাই জানেন। তাদের কোনো কাকা কি মামা কি থাকতে পারে না, যে হয়ত সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়? সেই অনাথাশ্রমের অত্যাচারের যে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছে?"

"কাকা মামা কেউ ছিল কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু এরকম সন্দেহ আপনার হ'ল কেন?

"হ'ল ডাঃ বাজপেয়ীকে দেখে। তাঁর অনেকগুলো চাল-চলন কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া পুলিশ আসছে শুনে তাঁর মুখের ভাব কি রকম বদলে গিয়েছিল, আমি স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করেছি।'

ঘোষাল এতক্ষনে সত্যি কৌতুহলী হয়ে উঠলেন,—পুলিশ আসছে শুনে মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল,—সত্যি।'

"হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওই মুখোশের মত মুখ ত দেখছেন। সেই মুখের চেহারাও অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল।"

"হু।"—ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বললেন,—এটা ভাববার কথা। ব্যাপার কি জানেন মিসেস লাহিড়ী, এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে অনেক দিক বিচার করে আমাদের কাজ করতে হয়। কার ভেতরে যে কি আছে আমরা কিছুই বাইরে থেকে জানিনা। অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না।"

কথাটা বলে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেই ঘোষাল চলে গেলেন। কণিকার মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। যে কথাটা মনের ভেতর

সে চেপে রাখতে চাইছে, ঘোষাল সেই কথাটাই তাকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছেন বলেই কি তার এই অসহ্য অস্বস্তি ?

'অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না!'—গানের ধুয়ার মত কথাটা কেবলই যেন তার কানে বাজছে।

বন্যা, ভূমিকম্প, মৃত্যু, হত্যা—যা-ই কেন ঘটুক না, মানুষকে আহারের চিন্তা তবু করতে হয়। আর তার দায়িত্ব শুধু মেয়েদের।

চাকর-বাকরেরাও এই সব ব্যাপারে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। কণিকাকেই তাই রান্নাঘরের কাজ নিজেকেই দেখতে হয়।

রান্নাঘরে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে সে একাই তখন তরকারির মশলা বাটছিল, এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে মধুসূদন সেখানে ঢুকল।

"শুনেছেন কণিকা দেবী—শুনেছেন!

কণিকা চমকে উঠে দাঁড়াল, —"আবার কি হয়েছে!"

"ইনস্পেক্টর সাহেবের রবারের ভেলাটা চুরি গেছে। ইন্‌স্পেক্টরের কি রাগ, যদি দেখতেন!

"কিন্তু সে রবারের ভেলা চুরি যাবে কেন ? তাতে কার কি লাভ ? —কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"আমিও ত তাই ভাবছি। ইন্‌স্পেক্টর যদি হার মেনে রবারের ভেলা করে চলেই যান, তাহলে ত খুনীরই সুবিধে। ইন্‌স্পেক্টর যাতে যেতে না পারেন সে ব্যবস্থা সে করবে কেন ? সত্যি যেন মানে হয় না কোনো কিছুর!

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, —"কি ভাবছেন বলুন ত ?

"ভাবছি, মানে হয়।

"কি মানে ?

"খুনী ঐ রবারের ভেলা লুকিয়েছে নিজে পালাবার জন্যে। আজ

রাত্রের মধ্যেই যদি সে ধরা না পড়ে, তাহলে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

"বাহবা রে, বাহবা! শেষ পর্যন্ত খুনী ধরাই পড়বে না! —মধুসূদন হতাশার মুখভঙ্গি করে বললে—"কিন্তু তাহলে ত ডিটেকটিভ গল্প হ'ল না?

"জীবনটা ডিটেকটিভ গল্প নয় মধু!"—কণিকা গম্ভীর-ভাবে বললে, "এখানে অনেক গল্পই মাঝপথে ছিঁড়ে যায়!"

কণিকার দিকে খানিক একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে মধুসূদন বললে,—"না, আপনি বড় গম্ভীর হয়ে উঠছেন, আমি পালাই!

"না, যেয়ো না।"—কণিকা বাধা দিলে।

মধুসূদন সত্যিই যেন বিমূঢ়,—'আপনি চান না যে আমি যাই! সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ, একা থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

"কিন্তু আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় করছে না? আমি যদি—আমি যদি সেই খুনে হই?—মধুসূদন স্থির দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

"তাহলে আমার ভুল বিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করব প্রাণ দিয়েই। ব'লে কণিকা হাসল। তারপর অকারণেই চোখ-দুটো মুছে বলল,—"না, শোন, তোমায় অত্যন্ত জরুরী কথা বলবার আছে।"

"কি?'—মধুসূদন একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে চোখটা ফিরিয়ে নিলে।

"তোমার নাম সত্যি মধুসূদন দত্ত নয়।

অনেকক্ষণ মধুসূদনের মুখে কথা নেই। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে সে বললে,—"না, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন!"

'জানিনি, কিন্তু সন্দেহ হয়েছে। কি তোমার আসল নাম?

কি হবে ব'লে? ব'লে মধুসূদন কাতরভাবে কণিকার দিকে তাকাল।

"তবু একজনকে বিশ্বাস করে তুমি শান্তি পাবে! বলো।"—কণিকার স্বরে কোমল অনুনয়।

"না, আমার নাম মধুসূদন সত্যি নয়।"—ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে মধুসূদন,—"আমার আসল নাম পবিত্র রায়। আমি—আমি পাটনা থেকেও আসিনি, এসেছি কলকাতা থেকেই পালিয়ে। আমার চিঠির খামটা আপনারা লক্ষ্য করেননি নিশ্চয়, তার পোষ্টাপিসের ছাপ দেখলেই বুঝতে পারতেন। ভুল বোঝাবার জন্যে আমি মিথ্যে করে পাটনার ঠিকানা চিঠির ওপর দিয়েছিলাম।"

কিন্তু কেন এসব করে দিলে!

'এখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে বিদেশে কোথাও পালাব বলে! ভেবেছিলাম এই নির্জন স্বাস্থ্যনিবাসে কেউ আমার খোঁজ পাবে না, খোঁজ করবার কথা ভাববেও না। গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমি নিঃশব্দে সরে পড়তে পারব।"

কিসের গোলমাল সেইটেই ত বুঝতে পারছিনা!"—কণিকা বললে।

"এখুনি বুঝতে পারবেন। আমি শুধু একটা সুটকেশ নিয়েই এসেছি কিন্তু ওই সুটকেস নোটের তাড়ায় ভর্তি।"

"তুমি! তুমি চুরি করেছ!"—কণিকা স্তম্ভিত।

"হ্যাঁ, চুরিই বলতে পারেন। অবশ্য আমার বাবার টাকাই চুরি করেছি। আমাদের বড়লোক বোধহয় বলা যায়। বাবার অনেক রকম ব্যাবসা আছে। তিনি আমাকে সেই ব্যবসাতে বসাতে চান, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস করুন, আমার কাছে সে সব বিষ। আমি পড়তে চাই, বৈজ্ঞানিক হতে চাই, ক্ষমতা আমার কতদূর আমি জানি না, কিন্তু সে-ই আমার স্বপ্ন। বাবা অত্যন্ত রাশভারী জেদী লোক, শুধু নিজের মতেই চলেন। আর কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে গ্রাহ্যই করেন না। একবার দুবার বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে আমি ভয়ে চুপ করে গেছি। কিন্তু অসহ্য লেগেছে আমার ওই ব্যবসাদারীর কাজ। তাই শেষ পর্যন্ত

অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পরিকল্পনা করে আগে থাকতে এইখানে চিঠি দিয়ে একদিন একটি ব্যবসার সিন্দুকের সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এই বন্যায় সব বন্ধ না হলে হয়ত খবরের কাগজে আমার ছবিসুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখতে পেতেন। বাবা নিজের চেষ্টার বড় হয়েছেন, তাঁর কাছে এরকম অপরাধের মার্জনা নেই।"—মধুসূদন একনিঃশ্বাসে এত কথা ব'লে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। একটা চৌকির ওপর বসে পড়ে দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আবার বললে,—"এখন আপনার ঘৃণা হচ্ছে? বলুন সত্যি করে বলুন!"

"না মধু। এতটুকু ঘৃণা হচ্ছে না"—কণিকার স্বর অত্যন্ত স্নিগ্ধ,—"কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতে হবে। পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কাপুরুষতা কিছু নেই। তুমি তোমার বাবাকে শেষবার গিয়ে বলো, বলো, তাঁর ব্যবসার কাজ তোমার দ্বারা হবে না। তাতে তোমার নিজের ইচ্ছে মত কাজ যদি তিনি না করতে দেন, সব ছেড়ে তুমি চলে এসো। জীবনে যদি তারপর বিফল হও, তবু মাথা তোমার উঁচু থাকবে। বলো, যাবে?"

"যাবো কণিকা দেবী।"

"কণিকা দেবী ভারী বিশ্রী শোনায়।"—কণিকা হাসল,—"ওটা বোলো না"

"কি বলব তা হলে?,,

"কি বলবে জান না,,—কণিকা কপট রাগ দেখালে।

একটু বিমূঢ় হয়ে থেকে মধুসূদন হেসে ফেললে,—"না, এখন হঠাৎ লজ্জা করছে।"

"একটু রসভঙ্গ করছি বোধহয়।"

দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। প্রবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের চেহারা তার গলার স্বরের মতই কঠিন।

পরমুহূর্তেই সে রাগে ফেটে পড়ল,—'এ ঘরে কি জন্যে তুমি

এসেছ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে কি এত তোমার দরকার?"

মধুসূদন প্রথমটায় সত্যিই হকচকিয়ে গেছল। এবার নিজেকে সামলে হেসে বললে, –"আমি রান্না শিখছিলাম।"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে!"—প্রবীর গর্জন করে উঠল,—এখুনি, এই মুহূর্তে!

কণিকা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার শান্ত দৃঢ় স্বরে বলল,—'যাও, মধু।

"আচ্ছা, যাচ্ছি তাহলে!"–একটু হেসে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মধুসূদন আবার ফিরল.–"আমি কিন্তু কাছাকাছিই থাকব।"

"বেরিয়ে যাও বলছি!"–প্রবীরের এ মূর্তি কণিকা কখনো দেখেনি

"যাচ্ছি যাচ্ছি"–ব'লে মধুসূদন চলে যাবার পরই প্রবীর ঘৃণাভরে কণিকার দিকে ফিরল,–"মধু" লজ্জা না থাক, তোমার ভয়ও করে না ওই উন্মাদ খুনেটার সঙ্গে একঘরে থাকতে! ওকে তুমি এখনো চিনতে পারোনি?"

কণিকা অদ্ভুতভাবে প্রবীরের দিকে চেয়ে থেকে বললে,–না পারিনি। কাকে কতটুকু আমরা চিনি! চিনি মনে করাই ভুল।

"কি তুমি বলতে চাচ্ছ?"

"কিছু না।"–বলে কণিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হঠাৎ বেশ একটু বললেই তাকে হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে প্রবীর বল,–"আমি তোমার চু-চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছি হঠাৎ, না? এই মধুসূদনের সঙ্গে দেখা হবার পরেই, কেমন!"

কণিকা কোনো উত্তর দিলে না। তার চোখদুটো তখন জ্বলছে!

প্রবীর আবার বললে,–"কিন্তু মধুসূদনের সঙ্গে নতুন আলাপ ত মনে হচ্ছে না! মনে হচ্ছে পুরোনো প্রেম আবার হঠাৎ দেখা হয়ে উথলে উঠেছে। কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল? কলকাতায়?

কণিকার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ বদলে গেল। জ্বালার বদলে সেখানে কেমন যেন একটা ভয় আর বিমূঢ়তা।

অস্পষ্টস্বরে সে বললে, — "কলকাতায়।"

"হ্যাঁ, কলকাতায় তুমি যাওনি গত শুক্রবারে, সারাদিন আমি যখন বাড়ি ছিলাম না সেই সুযোগে ? কি, চুপ করে আছো কেন ? গেছলে কি-না বলো।' — পকেট থেকে হঠাৎ দোকানের রসিদটা বার করে প্রবীর তার সামনে ধরলে, — "মনে যদি না থাকে ত তারিখটা পড়ে দেখো রসিদের।

কণিকার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, — হ্যাঁ গেছলাম। হয়ত তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারত।

আমার সঙ্গে। — প্রবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে। — কণিকা চৌকির ওপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে এনে প্রবীরের সামনে ধরে বললে, — "অতিবড় চালাক সাবধানীরও একটু ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এই কাগজটা যে কলকাতা থেকে কিনেছিলে সেটা ভুলে গিয়েই সঙ্গে করে এনেছিলে। কাগজটা যে তুমি এনেছ সেটাই আগে আমি মনে করতে পারছিলাম না। মিঃ ঘোষাল কাগজটা দেখিয়ে না দিলে জানতেও পারতাম না বা মনে করবার চেষ্টাও করতাম না।

"মিঃ ঘোষালের সঙ্গে এই নিয়ে তুমি আলোচনা করেছ ? — প্রবীর উত্তেজিতভাবে কণিকার দিকে এগিয়ে এল।

"দাম্পত্য আলাপ বড় মধুর" — চাপা গলার একটু হাসির সঙ্গে কথাগুলো শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল।

বীরস্বামী যে কখন নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছেন, তারা টেরই পায়নি।

"কিন্তু গরজ বড় বালাই।" — বীরস্বামী আবার বললেন, — "ইন্‌স্পেক্টর

সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের এক্ষুনি তাঁর কাছে দোতালায় যেতে হবে।

"কেন? —প্রবীর অপ্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

"কেন, সেইটেই ত মজা! পুলিশ যে আজকাল আবার নাটুকে হয়ে উঠেছে তা জানতাম না। মিস্ ধর খুন হবার সময় আমরা যে যেখানে যেভাবে ছিলাম তিনি তারই আবার, কি বলে, পুনরাভিনয় চান। তাই থেকেই নাকি খুনীকে তিনি ধরে ফেলবেন।"

'এসব পাগলামির কোনো মানে হয় না —প্রবীর তিক্ত স্বরে বলে উঠল,—'আসল খুনীকে ছেড়ে রেখে দিয়ে উনি অভিনয়ের ছেলে-খেলা করছেন। এই অভিনয় করতে গিয়েই দেখবেন সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।

'সেটা আমার ধারনা'।—বীরস্বামী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন,—'কিন্তু আসল খুনীটা কে? ওই মধুসূদন?'

'তা ছাড়া কে? চলুন।'—বলে প্রবীর এগিয়ে গেল।

কণিকা কিন্তু আপত্তি জানিয়ে বললে,—'আমি কিন্তু যাচ্ছি না, আমার রান্নাবান্না আছে। আমি না গেলেও মিঃ ঘোষাল কিছু মনে করবেন না।'

'আমিও তাহলে থাকি আপনাকে সাহায্য করতে'?—বলে বীর-স্বামী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'না না, চলুন, সবাইকে যেতে হবে।'—প্রবীর ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে।

বীরস্বামী আবার সেই অদ্ভুত ভাবে খুক খুক করে হেসে বললেন,-'দেখেছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী আমার একা থাকতে দিতে চান না। আমাকেও ওঁর ঠিক বিশ্বাস নেই!'

নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি শুধু হাসলেন।

ওপরে যাবার পর আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে ঘোষাল বললেন,—"আগে যেখানে যে রকম যা হয়েছিল তাই আবার সকলকে করতে হবে বটে, কিন্তু একটু অন্যভাবে। প্রত্যেকের জায়গা এবার বদল হয়ে যাবে। যেমন—নিচের ঘরে টেলিফোনের কাছে থাকবেন এবার ডাঃ বাজপেয়ী আর তাঁর ঘরে আসবেন মিঃ লাহিড়ী। বীরস্বামী যাবেন রান্নাঘরে, আর তাঁর জায়গায় অর্গ্যান বাজাবেন মিসেস লাহিড়ী।'

'এ অদল-বদল কেন?'—ডাঃ বাজপেয়ী, বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কারণ, তাহলে আমাদের মধ্যে যিনি সত্য কথা বলেননি তাঁর ফাঁকি ধরা পড়বে।'

'কেমন করে আমিত বুঝতে পারি না।'—বৃদ্ধ বেণীবাবু বললেন।

ঘোষাল হেসে বললেন,—'বোঝার ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন-না, আর তা ছাড়া আপনাকে বদলি কোথাও যেতে হবে না। আপনি নিজের ঘরে যেমন শুয়ে ছিলেন তাই থাকবেন।

'তাহলে আর দেরী কেন? শুভস্য শীঘ্রম।'—বলে বীরস্বামী উঠে পড়লেন।

'দাঁড়ান বীরস্বামী!'—ঘোষাল তাঁকে থামালেন,—'আপনি শুধু মিসেস লাহিড়ীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যান' কিভাবে ব'সে আপনি কি বাজিয়েছিলেন।'

'তাও দেখাতে হবে। বেশ।—বীরস্বামী কোনের অর্গ্যানটার কাছে গিয়ে টুলের ওপর বসলেন, তারপর বড় বাজিয়ের মত সকলকে একবার মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে গম্ভীর ভাবে ঘোষনার সুরে বললেন

—'এইবার - এইবার আপনারা সুবিখ্যাত অর্গ্যান-বাদক শ্রীরামানুজ বীরস্বামীর আশ্চর্য্য অর্গ্যান-বাদন শুনতে পাবেন।'

প্রবীর চাপা-গলায় ঘোষালকে বললে, — 'অসহ্য ভাঁড়ামি!'

'ওই ভাঁড়ামিটাও একটা মুখোস, মিঃ লাহিড়ী!' — বলে ঘোষাল হাসলেন, — 'ওই মুখোসগুলোই ভেদ করতে হবে।'

বীরস্বামী তখন এক- আঙুলে তাঁর বাজনা শুরু করেছেন। সে বাজনার সুরে কণিকার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেমন শিউরে উঠলো।

ঘোষাল তার দিকেই চেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, — 'পারবেন মিসেস লাহিড়া এইভাবে বাজাতে?'

দাঁতে দাঁতে চেপে কণিকা বললেন, — 'পারব!' — অন্তঃ একটা অনুভূতি তার মধ্যে জাগছে। জাঁতাকলের মত একটা ফাঁদ যেন ধীরে ধীরে তাকে চেপে ধরছে। মুক্তি নেই কিছুতেই মুক্তি নেই!

'তাহলে আপনি গিয়ে যথাস্থানে বসুন। আপনারাও চলুন যে যার নতুন জারগায়।' — ব'লে ঘোষাল আর সকলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দরজায় একটু থেমে আবার নির্দেশ দিলেন — 'ঠিক পাঁচ মিনিট। সামনে হাতের ঘড়িটা রেখে সময় দেখে নিতে পারেন।'

ঘোষাল চলে গেলেন!

এক - দুই - তিন — চার

পাঁচ মিনিট হবার আগেই শরীরটা আপনা থেকে কেমন শিউরে উঠল। কি রকম হঠাৎ যেন তার ভয়-ভয় করছে। এ-বাড়ীতে সে ত একলাও থেকেছে কত দিন! এরকম ত কখোনা মনে হয়নি।

হঠাৎ দূর থেকে শিসের শব্দ সে শুনতে পেল। কে শিস দিচ্ছে মধুসূদনের জায়গায়? ডাঃ বাজপেয়ী শিস্ দিয়ে গানের সুর তুলতেও পারেন তাহলে।

না — সময় ত হয়ে গিয়েছে। সে এক আঙুলে সুরটা বাজাতে

লাগল। চাবিতে আঙুল লেগে সুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরের ভেতরটায় যেন একটা ভয়ের শিহরণ উঠেছে।

ওই ত মিস্ ধরের ঘরে রেডিওটাও বেজে উঠল। মিঃ ঘোষালই নিশ্চয় চালিয়ে দিয়েছেন।

ঘাড়ে যেন জোলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়েকণিকা চমকে ফিরে তাকাল। ওদিকে কেউ দরজা খুলেছে নিশ্চয়। ঘরের পর্দার দরুন ওদিকটা ভালো দেখা যায় না। সন্ধ্যেও হয়ে এসেছে। কিন্তু কই না কেউ ত ঘরে আসে নি।

হঠাৎ বুকটা কণিকার কিরকম কেঁপে উঠল। যদি—যদি বীরস্বামীই নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান। চুপি চুপি বলেন,—কি বাজাচ্ছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার—কি বলে—অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত ?

জোর করে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কণিকা এই বিশ্রী মনের ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু—কিন্তু—একটা কথা হঠাৎ তার মনে হল। বীরস্বামী যে অর্গ্যান বাজিয়েছেন তা ত কেউ শুনেছে বলেননি। অর্গ্যান বাজাবার গল্পটাই কি বানানো ?

তিনি কি অর্গ্যান না বাজিয়ে মিস্ ধরের ঘরেই গেছলেন।

ঘোষাল কি এই ভাবেই তাঁর ফাঁকিটা ধরতে চেয়েছেন।

অর্গ্যান অবশ্য খুব আস্তে আস্তে বাজাতে বলা হয়েছে। কিন্তু তবু এবারে যদি বাইরে সে আওয়াজ শোনা যায় তাহলেই বোঝা যাবে বীরস্বামীর কথা মিথ্যে।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল বীরস্বামীই এসেছেন ভেবে কণিকা চীৎকার করতে যাচ্ছিল। কি ভাগ্যি, সময় মত সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে। ঘোষাল কি ভাবতেন তাহলে।

ঘোষালই ঘরে ঢুকেছেন। কাছে এসে বললেন,—'ধন্যবাদ মিসেস লাহিড়ী।'

ঘোষালকে এত খুশি কণিকা এ পর্যন্ত দেখেনি।

'যা চাইছিলেন তা পেয়েছেন তাহলে?' কণিকা হেসে জিজ্ঞাসা করলে বাজনা থামিয়ে।

'হ্যাঁ' —ঘোষালের মুখে বেশ একটু গর্বের আনন্দ,— 'ঠিক যা আশা করেছিলাম তাই।'

'কে মিঃ ঘোষাল?' —কণিকা আগ্রহে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'বাঃ—কে আপনি জানেন না।' এখনো বুঝতে পারেননি?' ঘোষাল হাসলেন,—'আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের এতক্ষনে বোঝা উচিত ছিল।'

'কিন্তু আমি ত ঠিক···কণিকা মনে মনে ভেবে নিলে যে, বীরস্বামীর কথাটা নিজে থেকে বলা ঠিক হবে না।

'না, যত বুদ্ধিমতী আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি তা নন। হ্যাঁ, তা বলতে গেলে আপনি বেশ বোকামির পরিচয় দিয়েছেন আগেই।,

'কিসে?' — কণিকা ক্ষুন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

'খুনীর তৃতীয় শিকার কে হতে পারে তা আমায় বুঝতে দেননি। সেই জন্যে আপনার বিপদও বেড়েছে।'

'কিন্তু আমি ত আপনার কথা বুঝতে পারছিনা'—কণিকা সত্যিই বিমূঢ়।

'বুঝতে পারছেন না? তবে শুনুন। আপনি আমার কাছে কথা লুকিয়েছেন মিস্ ধরের মত।'

'আমি এখনও বুঝতে পারছিনা, আপনি কি বলছেন।'

'খুব পারছেন।'—ঘোষাল একটু যেন রূঢ় হলেন,—চাঁপাখোলা অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনার সংস্রব যে ছিল তা আপনি প্রথমে আমার কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। মিস্ ধরকে আপনি চিনতেন, 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমও আপনার জানা। তবে কেন আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলেন?'

ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণিকা বললে,—তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি মন থেকে ও জায়গার স্মৃতি সত্যি মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ,' জানি কেন? আপনার নাম তখন কণিকা ছিল না। কেমন?

'হ্যাঁ,' আমার নাম ছিল তপতী।'

'জানি আপনার বয়স যা বলেছেন তাও সত্য। তখনই আপনার বয়স ইঁনিশ-কুড়ি আপনি ওইঅনাথাশ্রমে মিসেস এম ডি র তাঁবেদারিতে হেঁসেলের কাজ করতেন।'

'না।'

'আমি বলছি হ্যাঁ।'

'না না—বিশ্বাস করুন আমায়।'

'বিশ্বাসের যোগ্য আপনি নন। যে ভাই-বোন-তিনটি অনাথাশ্রম থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারা শুধু আপনাকেই বিশ্বাস করে তাদের পালাবার কথা জানিয়েছিল, আর আপনি ম্যানেজার ও মিসেস এম ডি -কে তা জানিয়ে দেন।'

'এসব মিথ্যে। —কণিকা কাতর ভাবে বলে উঠল, —'হেঁসেলে কাজ করতাম আমি নয় করতেন আমার দিদি। আমরাও দাঙ্গায় নিরাশ্রয় হয়ে ওখানে যায়গা পেয়েছিলাম। ম্যানেজার মিঃ দাস আর তার স্ত্রী ছিলেন পিশাচের মত নির্মম। তাঁরা ছেলেমেয়েদের খেতে পর্যন্ত দিতেন না। দিদি তখন বড় বলে তাকে হেঁসেলে কাজ করতে হ'ত সেখানে। ছেলেমেয়েদের দুঃখ দেখতে না পেরে দিদি ও আমি চুরি করে মাঝে মাঝে তাদের খাবার এনে দিতাম। তার জন্যে ধরা পড়ে মার খেয়ে পিঠের চামড়াও উঠে গেছে। ছেলেমেয়ে তিনটি পালাবার সময় দিদি তাদের বুঝিয়ে প্রথমে বারন করবার চেষ্টা করেছিল তারা কিছুতেই না শোনায় তাদের সাহায্যও করেছিল খাবার আর পয়সা দিয়ে। কিন্তু দিদি নয় হেঁসেলের আরেকজন চাকরানী তাদের পালাবার

কথা কেমন করে জেনে ফেলে মিসেস এম ডি -কে খুশী করবার আশায় বলে দেয়। সেই ছেলেমেয়ে তিনটি ত ধরা পড়েই, দিদিরও শাস্তির শেষ থাকে না। শুধু সেই ছেলেটির মারা যাওয়ার কথাই সকলে জানে,আমার দিদিও যে সেই নির্যাতনের পর ধীরে ধীরে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে মারা যায়।

কণিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর মুখ তুলে বললে, —"সে-সব দিনের কথা আমি সত্যি ভুলে যেতে চাই। আমি এই কবছরে জীবনে অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, অনেক পেয়েছিও। আমি তাই আগেকার সে সব দুঃস্বপ্নের দিন একেবারে মুছে ফেলে একটু শান্তি চাই।

"শান্তিই এবার পাবেন" —ঘোষাল কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন, —"আপনি নন,আপনার দিদিই হেঁসেলে কাজ করতেন তাহলে। ঠিক আপনার মতই অনেকটা চেহারা। আপনি কিছু হয়ত করেননি, কিন্তু সে অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনিও জড়িত। সে অনাথাশ্রমের সব কিছু নোংরা কুৎসিৎ অপবিত্র। পৃথিবী থেকে সেই অনাথাশ্রমের সব কিছু শেষ করে দেওয়া দরকার।'

'ওকি' ওকি করছেন মিঃ ঘোষাল?' —কণিকা কাৎরে উঠল।

পকেট থেকে পাকানো দড়িটা বার করে সামনে দোলাতে-দোলাতে ঘোষাল বললেন, —আমি ঘোষাল নই, ইনস্পেক্টর নই' কছুই নই—আমি সেই পানু, চাঁপাখোলা অনাথশ্রমের সেই পানু, আজকে বড় হয়ে সমস্ত অত্যাচার অবিচার নির্যাতনের যে শোধ নিতে এসেছে। পুলিশ আমায় ধরবার জন্য জাল পেতেছে, আমি পুলিশ হয়েই তাদের ওপর কী টেক্কা দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন। সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর ঘোষাল আসছে বলে নিজে ফোন করেছি। নিজে তারপর রবারের ভেলায় এসে আগে টেলিফোনের লাইন কেটেছি। মিসেস এম. ডি.-কে যেমন, মিস্ ধরকে তেমনি এই ফাঁস দিয়ে শেষ করেছি। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, করতে পারেনি। আমার ভেলাটা কে চুরি করেছে।

"আপনাকে শেষ করেই এখুনি নইলে পালাতাম। তবু আমি পালাবই, আর যদি ধরাও পড়ি দুঃখ নেই, ভারী মজা পেয়েছি। আমায় পাগল ব'লে পাগলা-গারদে ধরে রেখেছিল। সেইখানে বসে-বসে আমি সব ফন্দি করেছি, তারপর একদিন পালিয়েছি। পাগলা-গারদের ডাক্তাররা এখন দেখুক, পাগলের বুদ্ধি কত।' —ঘোষাল একটু থেমে বললে, —'ভয় পাবেন না এই ফাঁস গলায় লাগাবার আগে শুধু ভয়, নইলে টের পাবেন না।' —ঘোষাল ফাঁসটা তুলল।

হঠাৎ পেছন দিকে কি শব্দ শুনে একটু চমকে ফিরতেই একটি সোফার পেছন থেকে ডাঃ বাজপেয়ী ঘোষালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কখন নিঃশব্দে তিনি সোফার পেছনে এসে লুকিয়েছেন কনিকা টেরও পারনি।

ঘোষাল-বেশী পানু জোয়ান ছোকরা, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ী যেন লোহা দিয়ে তৈরী।

একটু ধ্বস্তাধ্বস্তির পরই দেখা গেল তাকে পিছমোড়া করে ডাঃ বাজপেয়ী তারই ফাঁসের দড়িতে বেঁধে ফেলেছেন।

চারিদিক থেকে অন্য সবাইও তখন ঘরে ছুটে এসেছে। তার মধ্যে বৃদ্ধ বেণীবাবুও।

কিন্তু এ কি রকম তাঁর চেহারা। কোথায় সেই অথর্ব পঙ্গু বৃদ্ধ, তার জায়গার সোজা শক্ত সমর্থ পুরুষ।

বেণীবাবু ঘরে ঢুকতেই ডাঃ বাজপেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললেন, —'ঠিক সময়েই ধরা গেছে স্যার। আমি গোড়া থেকেই নজর রেখেছিলাম পুলিশ আসছে ব'লে ফোন আসার কথা শোনার পর থেকেই আমি সজাগ আছি। ওর রবারের ভেলাটা চুরি করে পালাবার পথ আগেই বন্ধ করেছি তাই। তবে আপনি নিজেও আসবেন আশা করিনি"।

'কিন্তু এসেও ত মিস্ ধরের মৃত্যুটা ঠেকাতে পারলাম না। আচ্ছা আজকেই বোধহয় আমাদের খোঁজে ছুটো নৌকো আসবে। না-আসা

পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বেঁধে রাখো।"

বীরস্বামী দুজনের দিকে চেয়ে সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন,—"কিন্তু আপনারাই আসল পুলিশের লোক। কেয়া তাজ্জব। কেয়া তাজ্জব বাজপেয়ী আপনার নাম নিশ্চয় নয়?"

ডাঃ বাজপেয়ী বলে পরিচিত পুলিশের লোকটি হেসে বললে,—"না, আমি দাশরথি ঘোষ। ইন্‌স্পেক্টর ঘোষ বলতে পারেন।"

"আর উনি?

"উনি ইসমাইল সাহেব, এখানকার আডি-সি।

ডাঃ বীরস্বামী খুক খুক করে হেসে উঠলেন, "এখানে সবাই তাহলো একরকম নাম ভাড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে, শুধু আমি বাদে।"

"আমিও নয়। আমার নাম প্রবীর লাহিড়ী। আগ্রায় মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গিয়ে বার্থ-রেজিষ্টারে নাম আছে দেখে আসতে পারেন।

"আমি একটা অনুরোধ করতে পারি?" এতক্ষণে মধুসূদনের গলা শোনা গেল, "আমার এই সুটকেসটার সঙ্গে আপনাদের নৌকোয় আমায় একটু জায়গা দেবেন? আমার কলকাতায় ফেরা অত্যন্ত জরুরী।

ইসমাইল সাহেব ঠাট্টা করে বললেন, "শুধু সুটকেসটাকে জায়গা দিলে হবে না?

"না, বিশ্বাস করে আপনাদের পুলিশের হাতেও এটা ছাড়তে পারব না মধুসূদনরূপী পবিত্র হেসে বললে, "স্যুটকেসে-ভর্তি নোটের তাড়া কি-না?"

ঠাট্টা ভেবে সবাই হেসে উঠল।

পবিত্র তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, "হোটেলের মালিকরা গেলেন কোথায়?

"বোঝাপড়া করতে নিশ্চয়। বন্যার জলে সব ঘুলিয়ে দিয়েছে কিনা।" ব'লে বীরস্বামী হেসে উঠলেন।

মধুসূদন-রূপী পবিত্র আর তখন সেখানে নেই।

নিচে নিজের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সত্যিই তখন বোঝাপড়া চলছিল। কণিকা অত্যন্ত অপরাধীর মত বললে, 'আমায় ক্ষমা করো আমি তোমাকে পর্যন্ত সন্দেহ করেছিলাম। সত্যি সেদিন তুমি যে কলকাতায় গেছলে আমায় জানাওনি কেন?

জানাইনি তোমায় একটু অবাক করে দেব বলে। আমাদের বিয়ের তারিখে তোমার একটা উপহার কিনতে গেছলাম লুকিয়ে। কিন্তু তুমি ত আমায় কলকাতা যাওয়ার কথা লুকিয়েছ!"

কণিকা হেসে বললেন,—"তুমি অত রেগে না থাকলে রসিদটা পড়লেই আমার যাওয়ার কারণ বুঝতে পারতে। রসিদ একটা ফাউন্টেন-পেনের, বুঝেছ? তোমারই জন্যে কেনা।'

হঠাৎ দরজাটা খুলেই মধুসূদন ওরফে পবিত্র বললে,—'স্যরি' আমার ঠিকানা আপনাকে দিতে এলাম কণিকাদি। বাবার সঙ্গে যদি বনিবনাও হয়, তাহলে আমি চিঠি দিলে যেন উত্তর পাই।

"তা ত বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ কণিকা-দি এল কোথা থেকে?"—প্রবীর এখনও মধুসূদনের ওপর খুব প্রসন্ন হতে পেরেছে মনে হ'ল না।

কিন্তু মধুসূদন-রূপী পবিত্রর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, একটু হেসে সে বললে,—"আগেই উনি বলবার অনুমতি দিয়ে ছিলেন, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করছিল।

কিছুদিন বাদেই লাহিড়ীদের নামে স্বাস্থ্যনিবাসে একসঙ্গে একটি চিঠিও একটি পার্শেল এল।

চিঠিটা মধুসূদন ওরফে পবিত্রর। লিখেছে: বাবা মত পাল্টেছেন, পাল্টেছেন বোধ হয় সুটকেস-ভর্তি নোটের তাড়া ফেরত পেয়ে অবাক হয়। আমি ইউরোপ যাচ্ছি শীগ্‌গীরই পড়তে। যাবার আগে দেখা করবে নিশ্চয়।

আর প্যাকেটটি পাঠিয়েছেন বীরস্বামী।

ভেতরে একটা অত্যন্ত দামী ও দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ফাউন্টেনপেন ও পেন্সিলের ডেস্ক সেট আর তার চেয়ে ও দুর্লভ ও দামী মেয়েদের একটা হাতঘড়ি। তার-ই সঙ্গে ছোটো একটি কার্ডে লেখা – 'বীরস্বামীর ঋণশোধ'।

জিনিসগুলো দেখে প্রবীর ও কণিকা হতভম্ব। এসব জিনিস ত আজকাল পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।

"বীরস্বামী কি চোরাই মালের কারবারী নাকি?" – প্রবীর বলে ওঠে বিমূঢ় ভাবে।

কণিকা আঙুল তুলে তাকে শাসিয়ে বলে, – "ছাখো যা শিক্ষা আমাদের হয়েছে, তার পর কাউকে সন্দেহ করবে না, বিশ্বাসও না।

॥ সমাপ্ত ॥